ছোটদের গোর্কির

মা

ছোটদের গোর্কির

খগেন্দ্রনাথ মিত্র ॥ ভাবানূদিত

ছোটদের বইয়ের স্বপ্নরাজ্য
শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা-৯

প্রকাশক

রবীন বল

৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড

কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ

দিলীপ দাস

দাম ঃ দশ টাকা

প্রথম মুদ্রণ

জানুয়ারি—১৯৮৮

মুদ্রাকর

সত্যনারায়ণ মণ্ডল

রামকৃষ্ণ সারদা প্রিণ্টার্স

৩৪, শ্যামপুকুর স্ট্রীট

কলিকাতা-৪
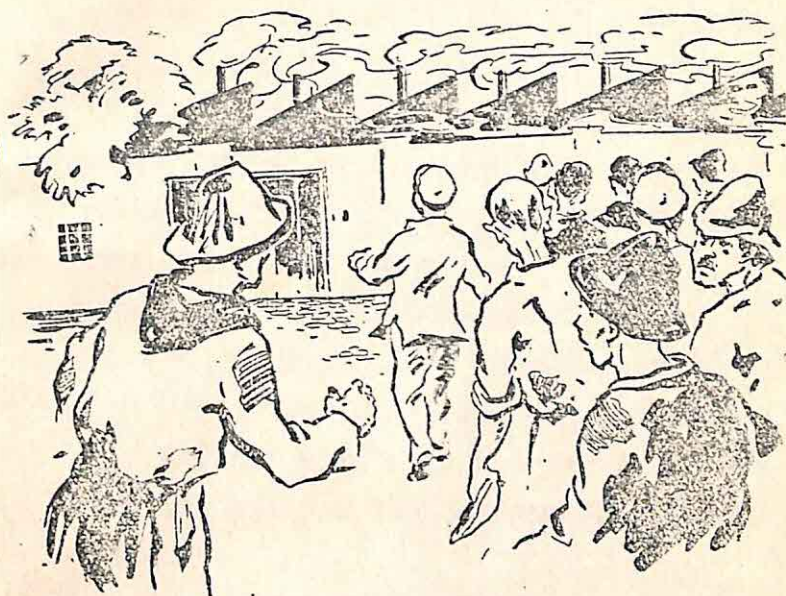
এক

মজুর-পল্লী। নোংরা, দুর্গন্ধময়, ছোট ছোট কুঠুরির সারি কাদাভরা ও খোয়া-তীক্ষ্ণ সরু রাস্তার দুপাশে গৃহহীন ভিখারী-দলের মতো ছেঁড়া, ময়লা, দুর্গন্ধময় কাঁথা ঢাকা দিয়ে ঘুমোচ্চে। আর, সেই সঙ্গে সুখের ও দুঃখের স্বপ্ন দেখে হাসচে, কাঁদচে।

তখনও আকাশে রাতের অন্ধকার লেগে থাকে, ঘুমোয় নগর, ঘুমোয় গ্রাম, কারখানার কলের ভোঁ বাজে। তীক্ষ্ণ দীর্ঘ তার শব্দ। মজুর-পল্লী জেগে ওঠে। তাদের শ্রম-ক্লান্ত দেহ তখনও পূর্ণ বিশ্রাম পায় না, চোখ থেকে ঘুম তখনও যায় না, যেতে পারে না, ছোট ছোট ঘরগুলো থেকে বেরিয়ে আসে তারা। পরনে তাদের ময়লা পোশাক, পায়ে ছেঁড়া

জুতো, রুক্ষ মুখ, লাল চোখ। তারা চলে সেই কাদাভরা, খোয়া-তীক্ষ্ণ রাস্তা দিয়ে কারখানার দিকে।

তখন কারখানার উঁচু চিমনিটা থেকে ওঠে ধোঁয়া কালো, ঘন, কুণ্ডলিপাকানো যেন একটা অজগর আকাশপথে উড়ে এসে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে পাতাল থেকে অন্ধকার শুষে খাচ্চে। মজুরেরা দলে দলে ঢুকে পড়ে কারখানায়। তারপর কল চলে। কলের ঘর্ঘর ধ্বনিতে সব যায় ডুবে। সন্ধ্যায় তারা দলে দলে বেরিয়ে আসে। ক্লান্ত দেহ, ধোঁয়ায়, ধুলোয়, তেলে মলিন। তাদের চোখে ক্লান্তি ও ক্ষুধা। কিন্তু কণ্ঠে তবু বাজে আনন্দের স্বর। সেদিনকার মতো তাদের দাসত্ব শেষ হয়। বাকি থাকে কেবল ঘরে গিয়ে খেয়ে ক্লান্ত দেহটাকে ঘুমিয়ে চাঙ্গা করে নেওয়া।

একটা দিন হজম করে নেয় কারখানা। কল তাকে খুশি-মতো শুষে নেয়, জীবনকে করে ফেলে দুর্বল। মানুষ নিজের অজানিতে এগিয়ে চলে কালের দিকে। তবুও তারা খুশী। তাদের আনন্দ জোগায় মদ ও আরও কিছু।

ছুটির দিনে তারা ঘুমোয় বেশি। তার পর উঠে সবচেয়ে ভাল পোশাক পরে যায় গির্জায়। অল্পবয়স্কেরা গির্জায় না গেলে বয়স্কেরা তাদের খুব একচোট বকে। তারপর বাড়ি ফিরে আবার সন্ধ্যা অবধি ঘুমোয়। সন্ধ্যায় পথে বসে আড্ডা। চলে কারখানার গল্প। তারা ফোরম্যানকে গাল দেয়। ঘরে ফিরে এসে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে, কখন কখন তাকে নিষ্ঠুর ভাবে মারে।

যুবক যারা তারা মদ খায়, এখানে-সেখানে আড্ডা দেয়, অশ্লীল গান গায়, নাচে। তারা অনেক রাতে বাড়ি ফিরে যায় ছেঁড়া পোশাক, মুখে মারের চিহ্ন নিয়ে। মারামারিতে জিতলে করে বড়াই, হারলে কাঁদে। কখনও কখনও বাপ-মা তাদের মাতাল অবস্থায় পথ বা ভাটিখানা থেকে তুলে আনে, গাল-মন্দ দেয়, মারে। আবার ভোরে ঘুম ভাঙিয়ে পাঠিয়ে দেয় কারখানার কাজে।

এই মজুরদের অন্তরে রয়েচে এক অস্বস্তি, অসন্তোষ। কিসের তা তারা বুঝতে পারে না। এটা বোঝাকে হাল্‌কা করে শান্তি পাবার জন্যে তারা সামান্য বিষয় নিয়ে হিংস্র পশুর মতো করে মারামারি, রক্তারক্তি কাণ্ড। এই অবস্থা তাদের জন্মাবধি। এ যেন কঠিন একটা রোগ। এই রোগটা থাকে জীবনের শেষ দিন অবধি। কিছুতেই তাদের ছাড়ে না। তাদের জীবন উদ্দেশ্যহীন। তারা নৃশংস ও পশু এই কলঙ্ক নিয়ে জীবন কাটায়।

বহুকাল ধরে তাদের জীবন-নদী এম্নি মলিন স্রোত ও আবর্জনা নিয়ে বয়ে চলেচে। প্রতিদিনই তারা করচে একই কাজ। তাই সবই একঘেয়ে। জীবনের এই ধারাকে বদলে ফেলবার, নূতন সুখী ও আনন্দময় জীবন গড়বার ইচ্ছা বা অবসর তাদের কারো যেন নেই।

কোন নূতন মজুর তাদের পল্লীতে এলে সে নূতন বলেই তার কথাবার্তায় তাদের দু'চারদিন কৌতূহল থাকে। তার মুখে বিদেশের গল্প শুনে বোঝে সব জায়গাতেই মজুরের অবস্থা এক।

কখন কখন দু-একজন নূতন লোক এসে এমন সব কথা বলে যা তারা কোন দিন শোনে নি। কিন্তু সে-সব কথায় তাদের বিশ্বাস হয় না। তারা আশাই করতে পারে না, স্বপ্নেও ভাবতে পারে না যে, তাদের এই ঘৃণ্য অবস্থার অবসান হবে, তারা উন্নত জীবন যাপন করবে। এই ঘৃণ্য অবস্থাটা তাদের অস্থি-মজ্জায় এমন গেঁথে গেচে যে, এটা দূর করতেও তারা ভয় পায়। কোন নূতন কিছুকে জীবনে আনতে তাদের বিষম বাধে।

ওই যে কামার মাইকেল ভ্লাশফ। ওরও জীবন কাটচে এম্নি ভাবে। লোকটা কাউকে গ্রাহ্য করে না। ওর গায়ে অসুরের শক্তি। কালো, গম্ভীর মুখ, ছোট ছোট চোখ, রুক্ষ ব্যবহার, মুখে সন্দেহের হাসি। ও কাজে বড় একটা কামাই করে না। ছুটির দিন হলেই ও জুড়িদারদের কাউকে না কাউকে মারবেই! তাই পল্লীর সকলে ওকে ভয় করে, কেউ ওকে পছন্দ করে না। ও হাতের কাছে লোহার ডাণ্ডা, পাথর, গাছের গুঁড়ি যা পায় তাই নিয়ে রুখে দাঁড়ায়। কেউ ওর কাছে এগোতে পারে না। ওর হলদে দাঁতগুলো কট্ মট্ করতে থাকে, ভয়ঙ্কর চোখ দুটো জ্বলে। শত্রু তাই দেখে সরে পড়ে।

ও সকলকেই বলে, "নরকের পোকা।" কথাটা ওর মুখে লেগেই থাকে। কারখানার বড় সাহেব থেকে পুলিশের দারোগা পর্যন্ত সবাইকেই ও ঐ বলে ডাকে। বাড়ি গিয়ে বউকেও বলে, "নরকের পোকা।"

তখন তার ছেলে পাভেলের বয়স চৌদ্দ বছর, একদিন সে তার চুলের মুঠি ধরতে গেল। ছেলেটা চট্ করে একটা হাতুড়ি তুলে নিয়ে রুখে দাঁড়িয়ে বললে, "ছুঁয়োনা বলচি!"

বাপ গর্জন করে উঠলো, "কী!"

পাভেল স্থির কণ্ঠে বললে, "আর আমি পড়ে পড়ে মার খাচ্চি না। ঢের হয়েচে!" এবং হাতুড়িটা মাথার ওপর ঘোরালে।

বাপ একবার তার দিকে তাকালো। তারপর তার পিঠে লোমশ হাতখানা রেখে বললে, "ঠিক হ্যায়!" তার বুক ভেঙে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল; কেবল বললে, "নরকের পোকা!"

তারপর একদিন স্ত্রীকে ডেকে বললে, "তোমার ছেলে বড় হয়েচে। এবার থেকে ওই তোমাকে খাওয়াবে। আমার কাছে আর কিছুই চেও না"

স্ত্রী সাহসে ভর করে বললে, "আর তুমি টাকাগুলো ওড়াবে?"

—"তোর তাতে কি? নরকের পোকা!"

সেই থেকে তিন বছর সে ছেলের দিকে ফিরেও তাকায় নি, তার সঙ্গে একটি কথাও বলে নি।

সে মারা গেল ভীষণ যন্ত্রণা পেয়ে।

সেদিন ভোরে যখন কারখানার ভোঁ বাজচে সে তখন মারা গেল। সে মরলে বউ কাঁদলো, ছেলে কাঁদলো না।

সবাই বললে, "বউটার হাড় জুড়লো। মাইকেল মরেচে।"

একজন বললে, "মরে নি, পশুর মতো ওর জীবনটা পচে নষ্ট হয়ে গেচে।"

কবর দিয়ে তারা ঘরে ফিরে গেল। কিন্তু মাইকেলের কুকুরটা গেল না, কার স্নেহ-কোমল পরশের অপেক্ষায় কবরের ভিজে মাটির ওপর বসে রইলো অনেকক্ষণ.।

দুই

তার দু' সপ্তাহ পরে—

সেদিন রবিবার। পাভেল মাতাল হয়ে টল্‌তে টল্‌তে বাড়ি ফিরলো। বাপের মতোই টেবিলে ঘুষি মেরে বললে, "জলদি খানা !"

মা তাকে শান্ত করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। দুঃখে তাঁর বুক ভেঙে যেতে লাগলো।

পাভেল জড়িত কণ্ঠে বলে উঠলো, "বাবার পাইপটা দাও। তামাক খাবো।"

সে মাতাল হয়েচে এই প্রথম। কিন্তু তার জ্ঞান লোপ পায় নি। তাই মায়ের ব্যথাকরুণ দৃষ্টি তাকে অস্থির করে তুললো। সে ভাবচে, "আমি মাতাল ? মাতাল ?" তার বুকের মধ্যে কান্না ঠেলে উঠতে লাগলো। এই কান্নাকে সে দাবিয়ে দিতে চাইলো মাতলামি দিয়ে।

মা বললেন, "এ কাজ কেন করলি বাবা ?"

সে অসুস্থ হয়ে পড়লো, বমি করতে লাগলো। মা তাকে

ধরে শুইয়ে ভিজে তোয়ালে দিয়ে কপাল ঢেকে দিলেন। সে যেন একটু সুস্থ হলো। কিন্তু মায়ের করুণ মুখখানি তাকে পীড়া দিতে লাগলো। সব কেমন জড়িয়ে অস্পষ্ট হয়ে যাচ্চে।

মায়ের স্নেহমাখা কণ্ঠস্বর তার কানে এল—"তুই মাতাল হলে বুড়ো মাকে কে দেখবে বল্? কি করে তাকে খাওয়াবি? মদ খাস্ নি বাবা।"

সে বললে, "সবাই খায়।"

ঠিক। মজুরেরা সবাই খায়। মদ ছাড়া আনন্দের তাদের আর কিছুই নেই। তবু বললেন, "খাস্ নি বাবা। মদ খেয়ে তোর বাপ আমার সারা জীবন জ্বালিয়ে গেচে…"

তার বাপ যখন বেঁচে ছিল তখনকার কথা মনে পড়ে গেল। তখন পাভেল বাপের ভয়ে বাইরে বাইরে ঘুরতো। তাই মাকে তেমন দেখতে পেতো না। আজ ভাল করে দেখলো। বহুকালের শ্রমে ও স্বামীর নির্যাতনে তাঁর দীর্ঘ দেহখানি ভেঙে পড়েচে। দেখে মনে হচ্চে, তাঁর মনে সর্বদা যেন কিসের আঘাত পাবার ভয়। তাঁর চলা-ফেরা নিঃশব্দ। মুখখানি গোল, প্রশান্ত, কপালে চিন্তার রেখা; চোখ দুটি কালো, বেদনা ও উদ্বেগে ভরা। মাথার কালো চুলের রাশির মাঝে মাঝে সাদা রেখা যেন সেগুলি আঘাতের চিহ্ন। তাঁর চোখ দুটি দিয়ে জল গড়িয়ে পড়চে।

পাভেল বললে, "কেঁদো না মা। একটু জল দাও।"

মা উঠলেন; বললেন, "এনে দিচ্চি।"

কিন্তু তিনি জল এনে দেখেন পাভেল ঘুমোচ্চে। গেলাসটি টেবিলে রেখে মা চোখের জলে ভগবানকে ডাকতে লাগলেন।

বাইরে তখন মজুরেরা মাতালামি করচে, গান গাইচে, চীৎকার করচে।

পরের দিনটা এল আগের আর সব দিনের মতোই একঘেয়ে এবং তার পরের দিনগুলোও হলো তেমি। কিন্তু তারপর থেকে পাভেল আর কোনদিন মাতাল হলো না।

পাভেলের দিন কাটে আর সব মজুর ছেলেদের মতোই। নাচ, গান, ভোজ, মদ—সন্ধ্যা কাটে এই সবেতেই। আর সবাইয়ের মতোই সে কিনলে একটা বেহালা, শার্ট, রঙিন নেকটাই ও ছড়ি। এগুলো হলো বাবুগিরির অঙ্গ। কিন্তু তার এসব কিছুই ভাল লাগে না। এ সবে সে আনন্দ পায় না।

সে মাকে বললে, "মা, ওরা যেন এক একজনে এক একটা যন্ত্র—প্রাণ নেই, অথচ চলেচে। আমি এবার থেকে মাছ ধরতে, কি শিকারে যাবো।"

কিন্তু এ দুটির একটিও হয়ে উঠলো না। সকলে যে পথে চলে সে পথ ছেড়ে দিয়ে সে চললো অন্য পথে। আড্ডায় যাওয়া সে একরকম ছেড়েই দিলে।

মায়ের চোখ খুব তীক্ষ্ণ। দেখলেন, ছেলের মুখে-চোখে এমন একটা ভাব ফুটে উঠেচে যা আগে কখন ছিল না। তার মনে যেন কিসের একটা আগুন জ্বলচে। কিসের ওপর যেন তার রোষ। বন্ধুরা তাকে ডেকে ডেকে পায় না, তাই আর আসে না। ছেলে যে নিজের একটি বিশিষ্ট পথে চলেচে এতে

তিনি খুশীই হলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে আবার ভয়ও হতে লাগলো, সে যেন এমন পথে চলেচে যা খুব গোপন। সেই-জন্যেই তাঁর ভয়।

মা দেখলেন, সে বই আনে, লুকিয়ে পড়ে আবার লুকিয়ে রাখে। মাঝে মাঝে তা থেকে কিছু কিছু কাগজে নকল করে কাগজখানাও লুকিয়ে রাখে। অনেক রাত অবধি সে বই পড়ে ছুটির দিনে বেরিয়ে যায় সকালে, ফেরে অনেক রাতে। তার কথাবার্তা বদলে গেচে। তার মুখে এখন অনেক নূতন শব্দ তার সব-কিছু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ঘরে বই, দেওয়ালে ছবি। সে মদ খায় না, গালাগালি দেয় না। সকলের থেকে সে যেন ভিন্ন রকমের! এর মানে কি? মার ভয় হলো। সে শহরে যায়। কিন্তু তার বেচালও তো কিছু চোখে পড়ে না। সব টাকাই তো এনে দেয় তাঁর হাতে। তবে কি হলো?

মা ভাবেন।

এম্নি করে কেটে গেল দুটো বছর।

একটি রাতে খাবার পর পাভেল ঘরের এককোণে বই নিয়ে বসলো। মা নিঃশব্দে তার কাছে এসে দাঁড়ালেন।

পাভেল তাঁর দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো।

মা একটু ইতস্ততঃ করে বললেন, "একটা কথা জিগ্যেস করি। তুই দিন রাত কি পড়িস্?"

পাভেল বললে, "বস মা।"

মা একটু সঙ্কুচিত হয়ে তার পাশে বসলেন।

পাভেল বললে, "যে বই পড়া বারণ, আমি সেই বই

পড়চি। এ সব পড়া বারণ এইজন্যে যে এতে আমাদের মজুরদের আসল ছবি আঁকা আছে। এই সব বই লুকিয়ে ছাপা হয়। এ বই আমার কাছে আছে পুলিশ জানলে আমার জেল হবে। আমি সত্য জানতে চাই বলে, আমার জেল হবে!"

মা ছেলের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। মনো হলো, এ সে ছেলে নয়, কোন নূতন মানুষ। বললেন, "কেন এ কাজ করিস্?"

—"সত্য জানতে চাই।"

ভয়ে মার অন্তর কেঁপে উঠলো; চোখে জল এল।

পাভেল যেন তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিচ্চে এম্নি সুরে বললে, "কেঁদো না মা। দেখ দেখি কি জীবন তোমার? তোমার বয়স চল্লিশ বছর। কিন্তু বাঁচার মতো একটি দিনও বেঁচেছো কি? বাবা তোমাকে মারতেন। আজ বুঝচি কেন? তাঁর জীবন ছিল দুঃখে ভরা। সেই ঝাল ঝাড়তেন তোমার ওপর। কিন্তু দুঃখের কারণ কি তা তিনি জানতেন না। তিনি কারখানায় খেটেচেন ত্রিশ বছর। যখন প্রথম কাজ আরম্ভ করেন তখন সেখানে ছিল মাত্র দুটি দালান। এখন সেখানে উঠেচে সাতটা দালান। কিন্তু তিনি পেলেন কি? কলের উন্নতি হলো, কিন্তু মানুষ মরে গেল। কলের জন্যে খাটতে খাটতে মরে গেল—"

"তুমি জীবনে কত আনন্দ পেয়েচো? মনে করে রাখার মতো সুখের ছবি তোমার কি আছে?"

পাভেলের চোখ দুটিতে ফুটে উঠেচে এক সুন্দর আলো।

মা করুণ ভাবে ঘাড় নাড়লেন। সত্যই তো মনে করে রাখবার মতো সুখের দিন তাঁর জীবনে আসেনি। ছেলের মুখে আজ নূতন কথা শুনলেন। তাঁর মন আনন্দে ভরে উঠলো। বললেন, "তা তুমি কি করতে চাও?"

—"বই পড়তে হবে। পড়ে অন্যকে শিক্ষা দিতে হবে। মজুরদের পড়া দরকার। তাদের জানতে হবে জীবন কেন এত কঠোর—"

—"তা তুমি কি করবে বাছা? তুমি কি পারবে?"

পাভেল দৃঢ়কণ্ঠে বলে, "হাঁ।"

তারপর সে তেমনি আবেগে, উৎসাহে বলে চললো সেই মানুষগুলির কথা যারা চায় মানুষের কল্যাণ। এইজন্যে তারা একদল লোকের কাছে হয় অপরাধী। তারা তাদের পশুর মতো মেরে ফেলে, জেলে দেয়। এরা মানুষ নয় শয়তান!

সে বললে, "আমি এমন সব মানুষ দেখেচি যারা দুনিয়ার সেরা।"

তার কথা শুনতে শুনতে মায়ের মন ভয়ে কেঁপে উঠলো। বললেন, "তুমি সাবধানে থেক, পাশা।" কিন্তু তারপরই মনে পড়লো, তাই তো সে কি থেকে সাবধানে থাকবে? তাই আবার বললেন, "তুই বড় রোগা হয়ে গেচিস, বাবা। তোর যেমন খুশি হয় তেমন ভাবে চল্। কিন্তু এই এখানে যেসব লোক আছে এরা পরস্পরকে ঘৃণা করে। পরের ক্ষতি করে খুশী হয়। ওরা আমোদ করে লোককে কষ্ট দিয়ে। ওদের

দোষী করতে গেলে, ওদের বিচার করলে ওরা তোকে ঘৃণা করবে, তোর সর্বনাশ করবে—"

পাভেল বললে, "জানি। কিন্তু মা আমি এক সত্যের সন্ধান পেয়েচি। তাই সব মানুষকে দেখচি নূতন করে, নূতন শ্রীতে। ছেলেবেলায় তাদের ভয় করতে শিখেছিলাম। বড় হয়ে শিখেচি ঘৃণা করতে। কিন্তু আজ তাদের দেখচি নূতন চোখে। সকলের জন্যেই আমার দুঃখ হয়। আজ বুঝেচি সব মানুষের মধ্যেই খানিকটা সত্য আছে।"

মা চুপ করে শুনতে লাগলেন। নূতন কথা। তাঁর মনে জাগলো আশা, ভয়, আনন্দ।

পাভেল চুপ করলো। রাত হয়ে এসেছিল। সে শুয়ে পড়লে মা চলে গেলেন।

তিন

সেদিন ছুটি—কারখানার ছুটি!

পাভেল বেরিয়ে যাবার সময় বললে, "মা, শনিবার এখানে কয়েকটি লোক আসবে।"

—"কারা?"

—"জন কতক আমাদের পল্লীর, বাকি শহর থেকে।"

ভয়ে মায়ের মুখখানি ম্লান হয়ে এল, চোখে প্রায় এল জল।

পাভেল তা দেখে বললে, "কি হয়েচে মা?"

মা চোখ মুছে বললেন, "কান্না পাচ্ছে, বাবা।"

পাভেল তাঁর সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে বললে, "ভয় পাচ্ছো ?"

"হাঁ। শহুরে লোক—কে জানে কেমন হবে।"

মায়ের কথায় পাভেল ব্যথিত হলো। পরক্ষণেই ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠলো, "এই ভয়ই আমাদের সর্বনাশ করে। তারা, শয়তানেরা এই ভয়টাই কাজে লাগিয়ে আমাদের আরো ভীরু করে তোলে! কিন্তু মা, যতদিন ভয় করবে, ততদিন এই সব মানুষ পচে মরবে। চাই সাহস। আমাদের নির্ভীক হতে হবে। সেদিন এসেচে।"

মা বললেন, "চিরটা জীবনই যে আমার ভয়ে কেটেচে। ভয় না করে কি থাকতে পারি ?"

— "তবুও তারা আসবেই। আমি যা ঠিক করেচি তা বদলাবে না।"

তিন দিন ধরে মায়ের বুক কাঁপতে লাগলো। যারা আসচে তারা না জানি কি ভীষণ মানুষ!

তারপর শনিবার এলো। মায়ের মন সেদিন কিছুতেই আর শান্ত হয় না, একটা অজানা আশঙ্কায় কেবলই কাঁপতে লাগলো। তারপর রাতে পাভেল যখন বললে, "মা, আমি বেরিয়ে যাচ্চি। একটু পরেই ফিরবো। ওরা এলে বসিও" তখন তিনি আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। তাঁর হাত-পা অবশ হয়ে এলো। তিনি চেয়ারে বসে পড়লেন।

বাইরে জমাট অন্ধকার যেন কালি জমে গেচে। মায়ের

কানে এল শিষ। কে যেন শিষ দিতে দিতে আস্‌চে। শব্দটা ক্রমে জানলার কাছে এল। পায়ের শব্দ শোনা যাচ্চে। কে সিঁড়ি দিয়ে উঠচে। মা সচকিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল। প্রথমে দেখা গেল একটা বড় টুপি। তার তলায় এলোমেলো লম্বা চুল। ঘরে ঢুকলো একটি রোগা মানুষ। সে হাত তুলে বললে, "নমস্কার।"

মাও প্রতিনমস্কার করে বললেন, "পাভেল এখনই ফিরবে?"

লোকটি শান্তভাবে গা থেকে ভেড়ার চামড়ার কোটটা খুলে তা থেকে তুষার ঝেড়ে ফেলে ঘরখানার চারধারে তাকিয়ে দেখে নিয়ে টেবিলের ওপর চেপে বসলো। তারপর মায়ের সঙ্গে দিব্যি আলাপ শুরু করলে, ঘর-সংসারের কথা।

মা বললেন, "পাভেল এলো বলে। বসো।"

—"বসেই তো আছি। আচ্ছা মা, তোমার কপালে ও দাগটা কিসের?"

কথাটা মায়ের ভালো লাগলো না; বললেন, "তোমার জেনে কি হবে?"

—"রাগ করো না। বলচি এই জন্যে যে, আমার মায়ের কপালেও ঐ রকমের একটা দাগ ছিল। দাগটা করে দিয়েছিলেন, আমার বাবা। তিনি ছিলেন মুচি। আমার মা ছিলেন ধোপার মেয়ে। বাবা তাঁকে কি মার যে মারতেন! উঃ!"

মা শান্ত হলেন। মনে মনে বললেন, "বেশ ছেলেটি।"

লোকটির নাম আনদ্রি।

তারপর এল একটি মেয়ে। খাশা মুখখানি, স্বাস্থ্য বেশ, মাথাভরা চুল, নাম নাটাশা। তাকে দেখে মায়ের মৃত মেয়েটির কথা মনে পড়লো, বুকে স্নেহ উথলে উঠতে লাগলো।

তারপর এল, তাঁদের পল্লীর পাকা চোর বুড়ো দানিয়েলের ছেলে নিকোলাই।

মা তো তাকে দেখে অবাক। বললেন, "তুমি!"

সে বললে, "পাভেল বাড়ি আছে?"

—"না।"

নিকোলাই আন্‌দ্রি ও নাটাশার দিকে তাকিয়ে বললে, নমস্কার, বন্ধু।"

নাটাশা হাসিমুখে তার করমর্দন করলে।

মা অবাক! নিকোলাইও এদের দলে আছে? তারপর এল কারখানার চৌকিদার শামোভের ছেলে। তার সঙ্গে আর একটি অচেনা ছেলে।

সকলের শেষে এল পাভেল। তার সঙ্গে কারখানার দু'জন মজুর। একজন হলো, ইয়াকোভ।

মা পাভেলকে জিগ্যেস করলেন, "এরাই গোপন-সভার লোক?"

—"হাঁ।" বলে পাভেল ঘরে ঢুকলো।

ঘরের মধ্যে সভা বসেচে। এক কোণে জ্বলচে একটি আলো। তার নিচে বসে আছে নাটাশা। সে একখানি বই পড়ে সকলকে শোনাচ্চে। আর সবাই বসেচে টেবিলের

চারধারে। নাটাশা পড়চে, "লোকে এমন হীন জীবন যাপন করে কেন বুঝতে'হলে—"

আনদ্রি তার সঙ্গে জুড়ে দিলে, "আর মানুষ কেন এত হীন হয় বুঝতে হলে—"

—"দেখা দরকার মানুষ গোড়ায়, সেই প্রাচীন কালে কি ভাবে জীবন-যাত্রা শুরু করেছিল।"

বই থেকে নাটাশা পড়তে লাগলো, আদিম মানুষেরা কেমন ভাবে জীবন যাপন করতো সেই কাহিনী।

হঠাৎ নিকোলাই বলে উঠলো, "মানুষ কেমন ভাবে জীবন যাপন করতো সে কথা জানতে চাই না। মানুষের কি ভাবে বাঁচা উচিত সে কথাই জানতে চাই।"

ইয়াকোভ বললে, "সামনে এগোতে গেলে পিছনের কথাও জানতে হবে।"

এম্নি ভাবে তর্ক শুরু হলো।

নাটাশা বলে উঠলো, "শোন ভাইসব! সবকিছুই আমাদের জানতে হবে। যা-কিছু সত্য, যা-কিছু আমাদের জানা দরকার সবই।"

পাভেল বললে, "কেবল পেট বোঝাই করাটাই কি সব? না। আমরা চাই মানুষ হতে। আমরা বেঁচে থাকতে চাই মানুষের মতো মানুষ হয়ে। আমরা দেখাবো, মজুর হলেও আমাদের বুদ্ধি আমাদের যারা কর্তা সেজে ঘাড়ে বসে আছে তাদের সমান। আর শক্তিতে আমরা তাদের চেয়ে অনেক বেশি।"

ছেলের বক্তৃতায় মায়ের বুক ফুলে উঠলো।

আনদ্রি বললে, "বন্ধুগণ! আমাদের এই পচা জীবন পার হয়ে যেতে হবে কল্যাণময় ভবিষ্যতের দিকে।"

এম্নি এলোমেলো তর্ক চললো। তারপর রাত যখন দুপুর হলো তখন সভা ভাঙলো। সকলে যে যার ঘরে চললো।

মা জিগ্যেস করলেন, "ওই মেয়েটি কে?"

পাভেল বললে, "শিক্ষিকা।"

—"এই শীতে ওর গায়ে গরম পোশাক নেই! ঠাণ্ডায় অসুখ হবে যে। ওর আত্মীয়-স্বজন সব কোথায়?"

—"মস্কোতে ওর বাবা মস্ত লোহার কারবারি। আমাদের দলে যোগ দিয়েচে বলে ওকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েচে। পয়সাওয়ালা লোকের মেয়ে। দুঃখ-কষ্ট কখন পায় নি। কিন্তু আজ যাচ্চে একা শহরে পায়ে হেঁটে এই অন্ধকারে।"

—"শহরে যাচ্চে? কেন গেল? এখানেও তো থাকতে পারতো।"

—"তাহলে যে আমাদের দলের কথা প্রকাশ হয়ে পড়বে। আমরা তা চাই না।"

মা বললেন, "তোমাদের এর মধ্যে অন্যায় কিছু তো দেখলাম না। তোমরা খারাপ কাজ করচো না। তবুও—"

—"তবুও মা, আমাদের জেল হবে। আমাদের কাজে খারাপ কিছুই নেই। আমরা খারাপ কিছুই করি না। তবুও—"

ভয়ে মায়ের বুক কেঁপে উঠলো, বললেন, "ভগবান তোদের রক্ষা করবেন।"

পাভেল বললে, "রক্ষা আমরা কিছুতেই পাবো না।"

সে চলে গেল নিজের ঘরে।

মা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। অন্ধকার রাত। তুষার-ঢাকা পথ। ঝোড়ো বাতাস হুঙ্কার দিয়ে ছোট ছোট ঘুমন্ত বাড়িগুলোর চাল থেকে তুষার কণা উড়িয়ে নিয়ে যাচ্চে। নাটাশা একা চলেচে তার মধ্য দিয়ে। বাতাসে উড়চে তার পোশাক, পায়ে জড়িয়ে যাচ্চে; মুখে উড়ে এসে লাগচে তুষারের ঝাপটা। পথের ডান ধারে জলার কূলে কালো অরণ্য-প্রাচীর। তার পত্রহীন গাছগুলি বাতাসে হাহাকার করে উঠচে। দূরে—বহুদূরে দেখা যাচ্চে শহরের ক্ষীণ আলোক।

মা মেয়েটির জন্যে ভগবানের কাছে কাতর মিনতি জানাতে লাগলেন।

চার

দিন চলেচে। প্রত্যেক শনিবারে পাভেলের বাড়িতে দলের লোকদের বসে সভা।

নাটাশাও আসে। মায়ের তাকে বড় ভাল লেগেচে। তিনি তার জন্যে একজোড়া মোজা বুনচেন। একদিন তার পায়ে তা পরিয়ে দিলেন। নাটাশা বললে, "আমার এক ধাই

ছিল। সেও তোমার মতো আমাকে ভালবাসতো। মজুরদের ঃখের শেষ নেই মা। কী অত্যাচারের মধ্যে তারা জীবন াটায়! তবুও তাদের প্রাণে যেটুকু দয়া-ভালবাসা আছে দের প্রাণে তা নেই।" বলে সে হাত বাড়িয়ে দূরে তাদের দেখিয়ে দিলে।

মা বললেন, "তুমি আপন জনদের ছেড়ে, দুঃখ-কষ্ট মাথায় নিয়ে কেন এসেচো?"

—"শুধু মায়ের কথা ভেবেই আমার কষ্ট হয়। তিনি তামারই মতো। মাঝে মাঝে তাঁকে দেখতে ইচ্ছা হয়।"

এদিকে তর্ক ও আলোচনা জমে ওঠে। পাভেলের বক্তৃতা ক্রমেই বাড়ে। নাটাশার সঙ্গে তার ব্যবহার লক্ষ্য করে, মা নেক সময় ভাবেন, "আহা! মেয়েটি যদি আমার ছেলের উ হয়!"

মাঝে মাঝে নাটাশা আসে না। তার বদলে আসে আলেকসি আইভানোভিচ। তাকেও মায়ের লাগে বেশ। স মায়ের সঙ্গে আলোচনা করে খুব সাধারণ বিষয় নিয়ে।

শহর থেকে শশেংকা নামে আর একটি মেয়ে আসে। ময়েটি লম্বা। তার মুখখানি গম্ভীর। তার ভেতর থেকে কমন একটা তেজ যেন ফুটে বেরোয়। তার গলার স্বর রুক্ষ। স একদিন বললে, "আমরা সমাজবাদী।"

মা ছেলেবেলায় এই কথাটি শুনে ছিলেন। সমাজবাদীরা াকি জারের শত্রু। এরা হলো জমিদার। জার চাষীদের দাসত্ব থকে মুক্ত করে ছিলেন বলে তারা জারের ওপর এমন রেগে

ছিল যে, শপথ করেছিল জারকে খুন না করে চুল ছাঁটবে না। তারা তাই মাথায় বড় বড় চুল রাখতো। তারা জারকে খুনও করে ছিল। পাভেল তাহলে সেই দলে?

সভা ভেঙে গেলে মা তাকে জিগ্যেস করলেন, "তুই কি সমাজবাদী?"

—"হাঁ। কেন বলতো?"

—"তোরা জারকে খুন করবি?"

পাভেল হেসে বললে, "আমরা কাউকে খুন করতে চাই না, মা।" বলে সে মাকে তাদের কাজ ও উদ্দেশ্য বোঝালো।

মা আশ্বস্ত হলেন; ভাবলেন, তাঁর পাশা এমন কাজ কখন করতে পারে না।

পাভেলদের সভা বসতে লাগলো বেশি করে, সপ্তাহে দু'দিন। তারা গান গায়, নূতন সুরে নূতন গান গায়।

একদিন নিকোলাই বললে, "এবার রাস্তায় বেরিয়ে এই গান গাইবো।"

মারও অন্তর একটু একটু করে জেগে উঠতে লাগলো। একদিন আনদ্রিকে বললেন, "তোমরা খুব খাশা মানুষ। তোমাদের কাছে দেশ-বিদেশ কিছু নেই। ইহুদি, অস্ট্রীয়, আর্মেনীয় সবাই তোমাদের বন্ধু। সবারই দুঃখে তোমরা দুঃখী, সুখে সুখী।"

আনদ্রি বললে, "সারা দুনিয়া আমাদের মজুরদের। আমাদের জাতি নেই। সারা দুনিয়ার মজুর আমাদের বন্ধু, সাথী। ধনিকেরা আমাদের শত্রু। আমরা মজুরেরা সংখ্যায়

কত! কী তাদের শক্তি! আমরা এই দুনিয়ায় যে যেখানেই থাকি আমাদের মধ্যে বাঁধন শক্ত হচ্চে। নূতন যুগ দেখা দিয়েচে। সমাজবাদী মাত্রেই আমাদের ভাই।"

মায়ের মনে হয়, ঠিক। মজুরদের শক্তি বিরাট!

পাভেলদের দলের কাজ বেড়ে চললো। পাভেল চায় একখানা কাগজ বার করতে। কাগজখানিতে তাদের অবস্থার কথা থাকবে। মজুরেরা তা পড়ে নিজেদের অবস্থার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠ্‌বে।

একদিন নিকোলাই বললে, "আমাদের নিয়ে সকলে কানাঘুষো করচে! এই বেলা গা ঢাকা দাও!"

আনদ্রি বললে, "এত ভয় কিসের?"

আনদ্রিকে মায়ের বড় ভাল লেগেচে। সে যেন তাঁর আর একটি ছেলে। তিনি একদিন পাভেলকে বললেন, "ও এখানেই থাক্। ওকে যা ছোটাছুটি করতে হয়।"

পাভেল প্রথমটা আপত্তি করলে; তারপর বললে, "বেশ।"

আনদ্রি থাকতে লাগলো পাভেলদের বাড়ি।

পাঁচ

নিকোলাইর কথাই ঠিক। পাভেলের বাড়িখানা পল্লীর সকলের আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ালো। বাড়ির চারধারে নানা রকমের লোক দিন-রাত ঘুরে বেড়ায়।

ভাটিখানার মালিক বুড়ো একদিন মাকে পথে ডেকে বললে, "কেমন আছ? তোমার ছেলের খবর কি? ওর বিয়ে দাও না কেন? ওকে এখন সামলে রাখা দরকার। ওরা কেউ গির্জায় যায় না, পর্বে যোগ দেয় না, এক জায়গায় বসে ঘোঁট পাকায়। এ সব কি হচ্চে? এত গোপন পরামর্শ কিসের?"

মা কি বলবেন বুঝতে পারলেন না। তারপর একদিন তাঁকে সাবধান করলে এক বুড়ী। সে তাঁর পড়শী।

মা বাড়ি এসে ছেলেদের সব কথা বললেন। বললেন, "সবাই তোমাদের নিন্দা করচে। তোরা আর সবায়ের সঙ্গে মদ খাস না, বিয়ে করচিস্ না। অথচ কোথাকার সব মেয়েদের সঙ্গে মিশিস। পাড়ার মেয়েরাও সব তোদের ওপর বিরূপ—"

পাভেল বললে, "হোক।"

আনদ্রি বললে, "আঁস্তাকুড়! তাই সব কিছুতেই দুর্গন্ধ। আচ্ছা, মেয়েগুলো কি বোঝে না, বিয়ে করলে তাদের কি দশা হবে? এই দুঃখ-কষ্ট! এর ওপর যদি বিয়ে করে, ছেলেপুলে হয় তাহলে যে পচে মরবে।"

মা বললেন, "তা তো তারা দেখচে। তবুও আর কিইবা করবে?"

পাভেল বললে, "তাদের বুদ্ধি থাকলে জীবনধারণের পথ খুঁজে পেত।"

মা বললেন, "তোরা তাদের বুঝিয়ে দে।"

পাভেল বললে, "তারা বুঝবে না।"

আনদ্রি বলেল, "বেশ তো চেষ্টা করাই যাক্ না।"

পাভেল বললে, "চেষ্টা করতে গিয়ে দু'দিন বাদে বিয়ে করে বসবে। তাতে আমাদের কাজ কতখানি এগোবে ?"

মা চিন্তিত হলেন। দেখলেন, ছেলে বিয়ে করতে চায় না। এ এক আশ্চর্য ব্যাপার! তাঁর বড় দুঃখ হতে লাগলো। কিন্তু কি করবেন ?

রাতের বেলা মা শুয়েচেন। পাভেল ও আনদ্রি শুয়েচে পাশের ঘরে। দুই ঘরের মাঝে একটি কাঠের বেড়া। মার কানে এল পাভেল ও আনদ্রির কথা-বার্তা। তারা বিয়ে নিয়ে আলোচনা করছিল।

আনদ্রির ইচ্ছা সে নাটাশাকে বিয়ে করে। কিন্তু পাভেল তাকে বোঝাতে লাগলো, গরিব মজুরের বিয়ে করা উচিত নয়। তাতে দুঃখময় জীবনের দুঃখ আরও বাড়ে, দরিদ্রতার সীমা থাকে না। ভবিষ্যতে যাতে মজুরদের জীবন সুখের হয়, সেজন্যে এখন সব কিছু ত্যাগ করে কাজ করা উচিত।

আনদ্রি বললে, "তা কি মানুষ পারে ?"

—"তা ছাড়া আর উপায় কি ? আর কি করতে পারো ?"

—"এ অবস্থায় পড়লে তুমি শক্ত হতে পারতে ?"

—"শক্ত ? আমি শক্তই আছি।"

আনদ্রি চমকে উঠলো ; বললে, "অ্যাঁ !"

—"কাজেই ও কথা ভেবো না, কাজে এগিয়ে চলো। সর্বস্ব পণ করো। জীবন দাও। সব সুখ বিসর্জন দাও। ভবিষ্যৎ মজুরদের জীবন যাতে সুখের হয়, তারা যাতে মানুষের

মতো বেঁচে থাকতে পারে তারই জন্যে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ো। এই আমাদের ব্রত।"

আনদ্রি বললে, "বেশ।"

সে বুঝলে, পাভেল তার মতো অবস্থায় পড়েও নিজেকে সংযত করে রেখেচে।

তারা ঘুমিয়ে পড়লো।

মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

পরদিন সারা মজুর পল্লীতে উত্তেজনা দেখা দিল। সমাজতন্ত্রীরা মজুরদের মধ্যে ইস্তাহার ছড়িয়ে গেল। সেই ইস্তাহারে লেখা ছিল, মজুরদের আসল অবস্থা কি তার কথা। মালিকের সঙ্গে মজুরদের লড়াই, ধর্মঘটের হিসেব, এক জোট হয়ে দাবি আদায়ের জন্য মজুরদের আহ্বান ছিল তাতে।

সেই ইস্তাহার পড়ে মজুরদের মধ্যে নানা আলোচনা শুরু হলো। যারা বেশি মাইনে পায় তারা গেল সমাজতন্ত্রীদের ওপর চটে। তারা কর্তাদের ইস্তাহারগুলো দেখালে। অল্পবয়স্কেরা চঞ্চল হয়ে উঠলো। তাদের চোখ ফুটলো। কিন্তু বেশির ভাগ মজুরই বললে, "এ তো হুজুগ। এতে কিছুই হবে না।" তবুও তারা অন্তরে চঞ্চল হয়ে উঠলো।

সেদিন থেকে প্রত্যহ ইস্তাহার দেখা দেয়। এবং একটি দিন তা বার হতে দেরি হলে বা না বার হলে সকলেই অস্থির হয়ে ওঠে। তাতে তাদের প্রাণের কথা, আশার কথা থাকে যে!

মা জানতেন, এই ইস্তাহারের মূলে আছে তাঁর ছেলে। তাতে তাঁর মনে আনন্দ, গর্ব ও ভয় দেখা দিল।

সেই বুড়ী আবার এল সেদিন সন্ধ্যায়; বললে, "তোমায় বলি নি সেদিন? আজ তার ফল টের পাবে।"

মা বললেন, "কেন?"

—"পুলিশ আসবে, তোমাদের বাড়িতে, নিকোলাইদের বাড়িতে। মেজিনরাও বাদ যাবে না। এবার বোঝ ঠেলা!"

ভয়ে মায়ের হাত-পা অবশ হয়ে এল। তিনি বসে পড়লেন। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো, তাঁর ছেলেরও বিপদ। অমনি বুকে সাহস এল। ছুটলেন মেজিনদের বাড়ি।

খবর শুনে মেজিন বললে, "তুমি যাও। আমি সকলকে খবর দিচ্চি।"

মা বাড়ি এসে কাগজ-পত্র, বই যা পেলেন বুকে গুঁজে কম্পিত বুকে সারা ঘরে পায়চারি করতে লাগলেন। ভাবলেন, ছেলে বুঝি এখনই বাড়ি ছুটে আসবে। কিন্তু সে ও আনদ্রি এল কারখানার ছুটি হলে।

মা অবসন্ন দেহে বসে ছিলেন রান্নাঘরে বেঞ্চিতে। জিগ্যেস করলেন, "শুনেচো?"

পাভেল বললে, "হাঁ। কিন্তু তোমার ভয় করচে?"

আনদ্রি বললে, "ভয় করে লাভ নেই! তাতে বিপদ থেকে বাঁচা যায় কি? তবে কেন ভয় করচো মা?"

পাভেল বললে, "স্যামোভারটাতেও আগুন দিতে ভুলে গেচ?"

মা উঠে দাঁড়ালেন। অমনি কাগজ-পত্র, বইগুলো বেঞ্চির ওপর দেখা গেল। সেগুলো দেখিয়ে বললেন, "এই জন্যে।"

পাভেল ও আনদ্রি হেসে উঠলো।

পাভেল খান কয়েক বই বেছে নিয়ে বাইরে এক জায়গায় রেখে এল।

আনদ্রি মাকে সাহস দিয়ে গল্প বল্‌তে লাগলো, "ভয় নেই মা। ওরা একেবারে অপদার্থ। সারা বাড়িখানাকে পকেটের মতো উল্টে-পাল্টে খোঁজে, মুখে কালি-ঝুল মাখে। কিন্তু পায় কি? কিছুই না। শেষকালে বীরদর্পে রাস্তা কাঁপিয়ে চলে যায়। একবার ওরা আমার ওপর চড়াও করেছিল। আমার ঘরের যা-কিছু সব তচনচ করে আমায় ধরে নিয়ে গিয়ে জেলে রাখলে চারমাস। সেখানে না আছে কাজ-কর্ম, না কিছু। খালি কুঁড়ের মতো বসে থাকো। এই তো ব্যাপার! ওরাই বা কি করবে বল? সরকারের মাইনে খায়। একটা কিছু না করলে চাকরি থাকবে কেন?"

মা আশ্বস্ত হলেন।

ছয়

কিন্তু পুলিশ সে রাতে এল না, এল একমাস পরে হঠাৎ। রাত তখন দুপুর। পাভেল, আনদ্রি ও নিকোলাই গল্প করচে; মায়ের চোখে এসেচে তন্দ্রা।

আনদ্রি কি কাজে যেন রান্নাঘরে গিয়ে তৎক্ষণাৎ ফিরে এসে বললে, "পুলিশের সাড়া পাচ্ছি যেন।"

শুনেই মায়ের বুক কেঁপে উঠলো ; তিনি কাঁপতে কাঁপতে বিছানা থেকে উঠলেন। পাভেল বললে, "শুয়ে থাকো। উঠো না। তোমার অসুখ।"

পুলিশের দারোগা ঘরে ঢুকলো। সঙ্গে স্থানীয় চৌকিদার ফেদিয়াকিন।

ফেদিয়াকিন বললে, "এই পাভেল আর ওই ওর মা।"

দারোগা দারোগায়ী গলায় বললে, "তুমি পাভেল ভ্লাসব?"

—"হাঁ।"

—"তোমার বাড়ি খান্নাতলাস করবো।"

—"বেশ।"

পাশের কামরায় কি একটা শব্দ হলো। দারোগা ছুটে গেল সেখানে এবং বলে উঠলো, "তুমি কে? তোমার নাম কি? এদিকে এস।"

নিকোলাই বেরিয়ে এল। পুলিশ খানাতল্লাসী করতে লাগলো। জিনিষ-পত্র ভেঙে, উল্টে, ফেলে, ছিঁড়ে দক্ষযজ্ঞ শুরু করে দিল। মা তেম্নি শুয়ে আছেন।

দারোগা বললে, "এই বুড়ী ওঠ্।"

পাভেল বললে, "উনি অসুস্থ।"

—"তুমি থামো। এই বুড়ী—"

দারোগা বই-পত্র সব ছুড়ে ফেলছিল। নিকোলাই আর সইতে পারলে না ; বলে উঠলো, "বইগুলো সব ছুড়ে ফেলার দরকার কি?"

দারোগা তার দিকে কট্‌মট্ করে তাকালো।

মা তো ভয়েই সারা। আবার, নিকোলাইর সাহস দেখে অবাক হয়ে গেলেন। পাভেলকে ফিস্ ফিস্ করে বললেন, "নিকোলইকে চুপচাপ থাকতে বল।"

দারোগা ধমক দিয়ে উঠলো, "এই চুপ্। কি কথা বলচো? এ বাইবেল পড়ে কে?"

পাভেল শান্ত ভাবে বললে, "আমি।"

—"এই বইগুলো কার?"

—"আমার।"

—"হুঁ!" নিকোলাইর দিকে ফিরে জিগ্যেস করলে, "তুমি আনদ্রি?"

—"হাঁ।"

তাকে ঠেলা দিয়ে সরিয়ে আনদ্রি এগিয়ে এসে বললে, "আমার নাম আনদ্রি।"

দারোগা দুজনের দিকেই রক্তচোখে তাকিয়ে বললে, "সাবধান!" তারপর লম্বা জামার বুক পকেট থেকে এক তাড়া কাগজ বার করে বললে, "আনদ্রি, এর আগেও রাজ-নৈতিক অপরাধে তোমাকে গ্রেফতার করা হয়ে ছিল। তোমার ঘর খানাতল্লাস হয়।"

—"হাঁ। রস্টোভ আর সারাটোভে। কিন্তু সেখানকার পুলিশ ছিল ভদ্র। তারা আমার নামের আগে 'মিঃ' ব্যবহার করেছিল।"

দারোগা ভ্রূ কুঁচকে দাঁত বার করে বললে, "মিস্টার

পৃষ্ঠা: ২৭

দারোগা তার দিকে কট্‌মট্‌ করে তাকালো।

মা তো ভয়েই সারা। আবার, নিকোলাইর সাহস দেখে অবাক হয়ে গেলেন। পাভেলকে ফিস্‌ ফিস্‌ করে বললেন, "নিকোলইকে চুপচাপ থাকতে বল।"

দারোগা ধমক দিয়ে উঠলো, "এই চুপ্‌। কি কথা বলচো? এ বাইবেল পড়ে কে?"

পাভেল শান্ত ভাবে বললে, "আমি।"

—"এই বইগুলো কার?"

—"আমার।"

—"হুঁ!" নিকোলাইর দিকে ফিরে জিগ্যেস করলে, "তুমি আনদ্রি?"

—"হাঁ।"

তাকে ঠেলা দিয়ে সরিয়ে আনদ্রি এগিয়ে এসে বললে, "আমার নাম আনদ্রি।"

দারোগা দুজনের দিকেই রক্তচোখে তাকিয়ে বললে, "সাবধান!" তারপর লম্বা জামার বুক পকেট থেকে এক তাড়া কাগজ বার করে বললে, "আনদ্রি, এর আগেও রাজনৈতিক অপরাধে তোমাকে গ্রেফতার করা হয়ে ছিল। তোমার ঘর খানাতল্লাস হয়।"

—"হাঁ। রস্টোভ আর সারাটোভে। কিন্তু সেখানকার পুলিশ ছিল ভদ্র। তারা আমার নামের আগে 'মিঃ' ব্যবহার করেছিল।"

দারোগা ভ্রূ কুঁচকে দাঁত বার করে বললে, "মিস্টার

আপনার হুকুম তামিল করবো কি করে? দুজনে যে দুখানা হাতই ধরে আছে।"

দারোগা অপ্রস্তুত হলো। তারপর তাকে ও আনদ্রিকে গ্রেফতার করে নিয়ে চলে গেল।

তাতে পাভেলের মন দুঃখে ভেঙে যেতে লাগলো। পুলিশ তাকে নিলে না? এ যে অপমান!

মা বললেন, "ব্যস্ত হয়ো না। ওরা তোমাকেও নেবে।"

—"হাঁ।"

মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

পাভেল বললে, "দুঃখ করো না মা। শক্ত হও। তৈরী থাকো। তোমাকে অনেক সইতে হবে।"

সাত

পরদিন খবর ছড়িয়ে পড়লো যে, পুলিশ সে রাতে আরও কতকগুলো জায়গায় হানা দিয়েছিল। এবং বুকিন্, শেমিওলোভ, সোমোভ ও আরও পাঁচজনকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেচে।

ফেদিয়া সেদিন এসে পাভেলকে বেশ দম্ভের সঙ্গেই বললে, "আমার বাড়িতেও খানাতল্লাস করেছিল। তবে আমাকে ধরে নি।"

পাভেল তার কথা চুপ করে শুনে গেল। তার মন বিষিয়ে উঠছিল।

সে চলে গেলে একটু পরে এলেন বৃদ্ধ রিবিন। রিবিন তাদের প্রতিবেশী। তাঁর সঙ্গে পাভেলের আলাপ বেশ জমে উঠলো।

চমৎকার মানুষ! বললেন, "তোমরা খারাপ কিছুই করো না, তবুও লোকে তোমাদের খারাপ বলে। তোমরা গির্জায় যাও না। আমিও যাই না। এই সব ধর্মের ভণ্ডামী আমার ভাল লাগে না। তোমরা খাশা মানুষ। ওই সব ইস্তাহার তোমরাই বার কর?"

—"হাঁ।"

ভয়ে মায়ের বুক কেঁপে উঠলো। তিনি ঢাকতে চেষ্টা করলেন। বৃদ্ধ হাত নেড়ে তাঁকে আশ্বাস দিলেন এবং পাভেলকে বললেন, "খাশা লেখা। বেশ চিন্তাশীল রচনা। বেশ, বেশ। লোককে জাগাবে। সবশুদ্ধ বারোটা বেরিয়েচে।"

—"হাঁ।"

—"সবগুলোই আমি পড়েচি।"

তারপর দুজনে আলোচনা চললো।

রিবিন বললেন, "ঠিক বলেচো। বয়সে কে বুড়ো, কে যুবক তাতে কিছু এসে যায় না। কার চিন্তা ঠিক এটাই হচ্চে আসল কথা। আর দেখ, ভগবানকে দিয়ে শয়তানেরা কি না করচে। ভগবানের দোহাই দিয়ে লোককে দাবিয়ে রাখচে। সত্যের জন্যে তাদের লড়াই করতে দিচ্চে না। সত্যকে ঢেকে রাখচে। মুষ্টিমেয় একদল লোক তাদের ইচ্ছানুসারে সকলকে

চলতে বাধ্য করচে ঠিক বলেচো, আমাদের ধর্ম মিথ্যা। ও ধর্মে আমাদের ক্ষতিই হয়েচে।"

পাভেলের মা তাদের কথা শুনে ব্যথিত হলেন; বললেন, "তোমরা ভগবানের নামে, ধর্মের নামে কি সব কথা বলচো? এতে তোমাদের ভাল হবে না।"

পাভেল বললে, "মা, যে মঙ্গলময় ভগবানের পুজো তুমি করো আমরা তাঁর কথা বলচি না। আমরা বলচি, সেই ভগবানের কথা যাঁকে দিয়ে ওরা আমাদের দাবিয়ে রেখে ঠকাচ্চে, যাঁকে নিজেদের সুবিধামতো কাজে লাগাচ্চে।"

রিবিন বলে উঠলেন, "ঠিক। এই ভগবানকে বদলে ফেলতে হবে। এখন যা হচ্চে সেইটেকে বদলে ফেল। ভবিষ্যৎ আপনিই ভাল হবে।"

তারপর দুজনে আরও কিছুক্ষণ আলোচনা চললো। রিবিন চলে গেলেন।

মা বসে বসে তাদের কথা শুনলেন।

কেবল সেইদিনই নয় রিবিন আরও কয়েক দিন এলেন। পাভেল ও তাঁতে হলো তেম্নি তর্ক, তেম্নি আলোচনা। মা অনেক কথা শিখতে লাগলেন।

এদিকে পাভেলকে সব মজুরই শ্রদ্ধা করে। কর্তারা তাদের ওপর কোন অত্যাচার, কোন অবিচার করলেই তারা ছুটে আসে তার কাছে।

কারখানাটার পিছন দিকে ছিল একটা প্রকাণ্ড জলা জায়গা। বদ্ধ পচা জলে, ঝাউ ও বারচগাছের ঝোপ-জঙ্গলে

জায়গাটা ছিল নরকের মতো। গরম কালে সেখান থেকে উঠতো পচা, ভাপ্‌সা গন্ধ। সেই পচা বদ্ধ জলে জন্মায় মশা। মশার কামড়ে ছড়ায় ম্যালেরিয়া। মজুরেরা তাতে ভুগে ভুগে সারা হয়। জলাটা সাফ করলে মজুরদের স্বাস্থ্য ভাল হয়। জায়গাটা কারখানারই। কিন্তু সাফ করতে গেলে খরচ হবে অনেক। শুধু শুধু এতগুলো টাকা কর্তারা খরচ করবেন কোন প্রাণে? যে টাকাটা খরচ হবে সেগুলো যদি লাভের কড়ি ঘরে আনতো তাহলেও বা কথা ছিল।

কারখানার ম্যানেজার দেখলেন, জায়গাটা খুঁড়ে তার জল বার করে দিতে পারলে তাঁরও পকেটে বেশ মোটা টাকা যায়। কিন্তু খোঁড়ার খরচটা? তিনি এক মতলব করলেন। জায়গাটা পরিষ্কার করলে যখন মজুরদেরই স্বাস্থ্য ভাল হবে তখন খরচটা দেবে তারাই! তাদের কাছ থেকে খরচটা আদায়েরও ফিকির বার হলো। হুকুম দিলেন, মজুরদের প্রত্যেককে তাদের মজুরী থেকে প্রতি রুবলে দিতে হবে এক কোপেক। তা শুনে সঙ্গে সঙ্গে মজুরেরা উঠলো ক্ষেপে। এই হুকুমের আওতায় পড়লো কেবল তারাই, কেরানিসাহেবরা রইলেন বাইরে। তাঁরা হলেন ম্যানেজারের ডান হাত।

পাভেলের সেদিন শরীর খারাপ; কারখানায় যায় নি। দুজন এসে তাকে খবর দিল। তারা বললে, "সবাই বলচে, এমন আইন কোথায় আছে যে জলা সাফ করতে আমাদের মজুরী থেকে কাটবে! আইন না থাকলে কেন আমরা দেবো? তিন বছর আগেও আমাদের জন্যে নাইবার ঘর তৈরী

করে দেবে বলে এই রকম করে তিন হাজার আটশো রুবল আদায় করেছিল। কিন্তু সে সব টাকা গেচে ওর পকেটে।"

পাভেল বললে, "এ টাকাও ওই রকম করে ওদের পকেটে যাবে। এমন কোন আইন নেই যে ওরা এই রকম করে আমাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করবে। এটা ওদের জুলুম। তোমরা যাও। ওদের একথা বল গে।"

তারা চলে গেল।

পাভেল কাগজ-পেনসিল নিয়ে লিখতে বসলো। লেখা হয়ে গেলে বললে, "মা, এখনই শহরে গিয়ে এই কাগজখানা আমাদের লোকদের কাছে দিয়ে আসতে পারো? এটা আমাদের পত্রিকার পরের সংখ্যায় বার হওয়া চাই-ই। পারবে?"

যুবক-বৃদ্ধ সকলের কাছে ছেলের খাতির দেখে গর্বে ও আনন্দে মায়ের বুক ফুলে উঠেছিল। এখন তাঁর ওপর কাজের ভার দেওয়াতে আরও আনন্দিত হলেন; বললেন, "পারবো বৈকি।"

—"খুব সাবধানে নিয়ে যাবে।"

মা কাগজখানা নিয়ে পোশাকের ভেতর বুকে গুঁজে শহরে চলে গেলেন এবং অনেক রাতে ফিরে এলেন। দু-একদিনের মধ্যেই তার ফল দেখা গেল।

সেদিনও পাভেলের অসুখ। সে কারখানায় যায় নি। হঠাৎ দুপুরের দিকে ফেদিয়া ছুটে এল। বললে, "কারখানায় হুলস্থূল

পড়ে গেচে। মজুরেরা ক্ষেপে উঠেচে। তুমি চলো এখনই, সকলে তোমাকে ডাকচে। তারা কেউ কাজ করতে চাইচে না।"

পাভেল চললো।

মা বললেন, "ওর অসুখ। ও সেখানে গিয়ে কি করবে? আমিও যাবো।"

পাভেল কারখানায় গিয়ে দেখে, মজুরদের ভিড়—বাইরের ফটকে মেয়েরা চীৎকার করচে।

সে ভেতরে গিয়ে দেখে প্রকাণ্ড চত্বরটা মজুরে ভরে গেচে। পুরানো লোহার গাদার ওপরও জন কয়েক মজুর দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে বক্তৃতা দিচ্চে। চারধারে গোলমাল, গালাগাল, গরম গরম কথা। সে যেতে কে যেন বললে, "চুপ! চুপ! ওই পাভেল এসেচে।"

পাভেল শুনতে পেল রিবিন বলচেন, "আমাদের দাঁড়াতে হবে, লড়তে হবে ন্যায়ের জন্যে। আমাদের যে রক্ত ওরা পাত করচে তার জন্যে।"

সেই লোহার গাদার ওপর উঠে দাঁড়ালো পাভেল। সে বললে, "ভাই সব!"

তৎক্ষণাৎ সকলে চুপ করলো।

পাভেলের ভেতর জেগে উঠলো এক শক্তি। সে আবার বললে, "ভাই সব! মানুষের নিত্যকার যা দরকার সে সব জিনিষ গড়ে কে? আমরা মজুরেরা। কারখানা, রাস্তা, সেতু, কাপড়, ওষুধ, মুদ্রা, খেলনা—এক কথায় মানুষের যা কিছু

দরকার সে সব কারা চিরদিন তৈরী করে আসচে? আমরা মজুরেরা। কিন্তু কে আমাদের কথা ভাবে? কে আমাদের ভাল করতে এগিয়ে আসে? কে আমাদের মানুষ বলে মনে করে? কেউ না।"

মা একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন।

পাভেলের বক্তৃতার নানা রকমের মন্তব্য হাতে লাগলো।

পাভেল আবার বললে, "বন্ধুগণ, মুনাফাখোর মালিকদের সঙ্গে আমাদের বোঝাপড়ার দিন এসেচে। আমাদের রক্ষা করতে হবে আমাদেরই। আমাদের নীতি হবে সকলের জন্যে। সকলের জন্য প্রত্যেকে, প্রত্যেকের জন্য সকলে। ম্যানেজারকে ডেকে জিগ্যেস করা যাক। সে আমাদের কথার কি জবাব দেয় শুনবো আমরা।"

অম্নি চারধার থেকে আওয়াজ উঠলো, "ম্যানেজারকে ডাকো। সে এসে বলুক আমাদের।"

কিন্তু কে যাবে ম্যানেজারের কাছে? কারা হবে প্রতিনিধি?

বহু তর্কবিতর্কের পর প্রতিনিধি নির্বাচিত হলেন, রিবিন, পাভেল ও শিজভ। কিন্তু তারা ম্যানেজারের কাছে যাবার আগেই কারা বলে উঠলো, "ম্যানেজার আসচে। নিজেই আসচে।"

ম্যানেজার এল ভিড়ের মাঝখান দিয়ে সরু পথে। কেউ তার পথ করে দিলে না, সে নিজেই ভিড় সরিয়ে কারুর গা না ছুঁয়ে কেবল হাতের ইসারায় নিজের পথ করে নিয়ে এসে

উঠলো সেই লোহার গাদার ওপরে। তাকে দেখে মজুরেরা সব চুপ। সকলেই যেন ভয়ে ঘাবড়ে গেল। সকলেই হাতে টুপি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ম্যানেজারকে দেখচে।

ম্যানেজার দাঁড়িয়ে আছে—লম্বাচওড়া জোয়ান, মুখে অবজ্ঞা ও কর্তৃত্বের ভাব, ভ্রূ-কুঞ্চিত যেন তাদের কাউকেই সে পরোয়া করে না। সে বললে, "তোমরা কাজ ফেলে এখানে হল্লা করচো কেন? বল?"

কেউ উত্তর দিলে না। সব চুপ।

ম্যানেজার বললে, "উত্তর দাও। কেন হল্লা করচো?"

পাভেল এগিয়ে এসে রিবিন ও শিজভকে দেখিয়ে বললে, "মজুরেরা আমাদের এই তিনজনকে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করেচে আপনার কাছে গিয়ে কোপেক ট্যাক্সটা রদ করার জন্যে বলতে।"

ম্যানেজার তার দিকে না তাকিয়ে বললে, "কেন?"

—"ট্যাক্সটা বে-আইনী।"

—"বটে! তুমি দেখচো ওটা তোমাদের কাছ থেকে টাকা আদায়ের ফন্দি? কেমন?"

—"হাঁ।"

রিবিন ও শিজভকে জিগ্যেস করতে তাঁরাও ওই কথা বললেন।

ম্যানেজার পাভেলের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে বললে, "তুমি, পরিকল্পনাটার মধ্যে ভাল কিছু দেখতে পাচ্চো না? ওর মধ্যে তোমাদের ভাল করবার ইচ্ছা নেই কি?"

—"না। থাকতো যদি দেখতাম, কারখানা নিজের খরচে কাজটা করেচে।"

—"কারখানা কি দানছত্র? কাজে যাও সবাই। পনেরো মিনিটের মধ্যে না গেলে সবাইকে বরখাস্ত করবো।" বলে ম্যানেজার লোহার গাদার ওপর থেকে নেমে বীরদর্পে চলে গেল।

সে চলে যেতেই শুরু হলো গোলমাল।

একজন বললে, "ফ্যাসাদে পড়া গেল।"

কে একজন পাভেলকে বললে, "কি হে মাতব্বর! এবার বক্তৃতার ঠেলা সামলাও। ম্যানেজারকে দেখে সব যে কেঁচো হয়ে গিয়েছিলে! এবার?"

পাভেল বললে, "ভাই সব, আমার প্রস্তাব কোপেক-ট্যাক্স রদ না হওয়া অবধি আমরা ধর্মঘটে করবো।"

—"আমরা আহাম্মক কি না!"

—"এ ছাড়া ওদের কাবু করা যাবে না।"

—"এক কোপেকের জন্যে সকলের কাজ যাবে?"

—"কাজ যাবে কেন? আমরা ছাড়া কাজ করবে কে?"

—"কত লোক আছে।"

—"কারা করবে? বিশ্বাসঘাতকেরা?"

—"হাঁ—হাঁ।"

—"তার চেয়ে টাকাটা দেওয়াই যাক।"

পাভেল লোহার গাদার ওপর থেকে নেমে মায়ের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

রিবিন বললেন, "এই সব লোককে দিয়ে তুমি লড়াই জিতবে? এরা ধর্মঘট করবে? যদি করে তো বড় জোর শ' তিনেক লোক, সব ভীরু, লোভী। ওরা করবে ন্যায়ের জন্যে লড়াই?"

পাভেলের মুখ দিয়ে একটি কথাও বার হলো না। তার সব উৎসাহ গেল নিভে। নিজের শক্তির ওপর যে বিশ্বাস জেগে ছিল তাও গেল নষ্ট হয়ে। সে আর দাঁড়ালো না, মায়ের সঙ্গে বাড়ি চললো।

মজুরেরাও সকলে গুড়্ গুড়্ করে কাজে যোগ দিলে। কিন্তু পাভেল আর বাইরে থাকতে পারলে না, সেই রাতেই পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেল।

আট

পরদিন। শূন্য ঘর। মায়ের মন হু হু করচে। ভাবচেন, না জানি পুলিশ তাকে কত কষ্ট দিচ্চে। কত যন্ত্রণা পাচ্চে সে।

রিবিন এলেন; বললেন, "ভয় নেই। দুশমনগুলো কাল রাতে আমার বাড়িতেও হানা দিয়েছিল। কিন্তু আমায় নিলে না, নিলে পাভেলকে। ম্যানেজার চোখ-ইসারা করলে, আর পুলিশ ধরলে। ওরা চোরে চোরে মাসতুতোভাই। দুটিতেই ধনে-প্রাণে শেষ করেন।"

মা বললেন, "পাভেলের জন্যে এখন সকলের লড়া উচিত।"

রিবিন হেসে উঠলেন ; বললেন, "সে বড় শক্ত কথা ! কে লড়বে ? মালিকেরা শত শত বছর ধরে শক্তি সঞ্চয় করেচে। আমাদের মধ্যে কত বিভেদ ! ইচ্ছে করলেই কি সেই পাঁচীল ফেলে দিয়ে মেলা যায় ? যায় না। এই বাধা যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ আমরা একসঙ্গে মিলবো কি করে ? আগে দূর করতে হবে এই ব্যবধান।"

তিনি চলে গেলেন। তাঁর কথাগুলো যেন মা বুঝতে পারলেন। তাই মন কিছু শক্ত হলো।

রাতের বেলা এল শেমিওলোভ ও ইগর আইভানোভিচ। মা তাদের চেনেন।

ইগর বললে, "জানো দিদিমা, নিকোলাই জেল থেকে বেরিয়েচে।"

—"তাই না কি ? কত দিন যেন হলো সে জেলে ছিল ?"

—"পাঁচ মাস এগারো দিন।"

—"তা হবে। যে রাতে তাকে নিয়ে যায় সে রাতখানা মনে পড়চে।"

—"তার সঙ্গে পাভেল আর আনদ্রির দেখা হয়েছিল। পাভেল তোমায় বলে পাঠিয়েচে, ভয় পেও না আর আনদ্রি পাঠিয়েচে নমস্কার। জেলটা হলো আমাদের লড়াইয়ের মাঝে একটা বিশ্রামের জায়গা। ওতে ভয় পাবার কিছু নেই। কাল কত জনকে ধরেচে জানো দিদিমা ? চল্লিশ জনকে।"

—"বলো কি !"

—"আরও দশ জনকে ধরবে। তার মধ্যে এই যে একজন এখানে রয়েচে, শেমিওলোভ।"

মায়ের বুকের ভার একটু হালকা হলো। তাঁর ছেলে তাহলে একা নয়? বললেন, "তবে তোমাদের বেশিদিন রাখতে পারবে না।"

ইগর বললে, "ঠিক কথা। এখন একটি কাজের কথা শোন। কথাটা হচ্চে এই যে, সেই ইস্তাহারগুলো যদি এখন থেকে আর কারখানায় না যায় তাহলে কর্তারা কি ভাববে জানো? ভাববে, এই সব লিখতো, ছাপাতো, ছড়াতো ওরাই। না হলে ওদের ধরবার পরই সব বন্ধ হয়ে গেল কেন? তাহলে পাভেলদের আর জেল থেকে ছাড়বেই না। তাই এখন আমাদের কাজ হচ্চে ইস্তাহারগুলো আগের মতোই কারখানায় ছড়ানো। কিন্তু মুশ্‌কিল হয়েচে, কাকে দিয়ে সেগুলো কারখানায় ঢোকানো যায়? ফটকে আজকাল যেরকম কড়াকাড়ি! যে ঢোকে তারই পকেট হাঁতড়ে দেখে।"

মা তার মনের কথা বুঝতে পারলেন। তারা তাঁর সাহায্য চায়। ছেলের জন্যে তিনি না করতে পারেন কি? বললেন, "তা আমাকে দিয়ে কি হতে পারে বল?"

—"মেরী নিকোভনা তো রোজ ওখানে খাবার নিয়ে যায়। ওকে দিয়ে ইস্তাহারগুলো পাঠাতে পারবে না?"

মা বললেন, "তবেই হয়েচে। তাহলে বস্তিশুদ্ধ লোক জানতে পারবে।"

—"তবে কি করা যায়?"

—"আচ্ছা, আমি নিজেই কাজটার ভার নিলাম।"

—"বেশ! বেশ!"

মায়ের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বুঝলেন, ইস্তাহারগুলো আগের মতোই কারখানায় গেলে তাঁর ছেলের সুবিধা হবে। কর্তারা মনে করবে, এ সবের মূলে আছে ওরা ছাড়া আর কেউ।

তারা দুজনে নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেল। যাবার সময়ে বললে, "কাল তাহলে ইস্তাহারগুলো পাঠাবো, দিদিমা।"

পরদিন কারখানায় দেখা দিলে এক নূতন ফেরিওয়ালী। মা বললেন, "মেরী গেচে বাজারে। তার জায়গায় পাঠিয়েচে আমাকে।"

টিফিনের সময় মজুরেরা চারধার থেকে তাঁকে ঘিরে ধরলো। নানা জনে নানা কথা বলে তাঁকে সান্ত্বনা দিলে। আবার দু-একজন বললে, "তোমার ছেলেকে ফাঁসি দেওয়া উচিত সে আর যাতে লোককে বিগড়াতে না পায়ে।"

সে কথা শুনে ভয়ে মায়ের বুক কেঁপে উঠ্‌লো।

তখন কারখানায় ঘটছিল আর এক কাণ্ড। পুলিশ এসেছিল। তারা ধরে নিয়ে যাচ্ছিল শেমিওলোভকে। তাদের পিছনে আসছিল একদল মজুর। শ'খানেকের বেশিই হবে তারা। তারা আসছিল আর পুলিশকে টিটকিরি দিচ্ছিল, হাসছিল।

একজন শেমিওলোভকে উদ্দেশ্য করে বললে, "কি বন্ধু! হাওয়া খেতে যাচ্চো?"

আর একজন বললে, "কি খাতির দেখ! সঙ্গে দু'জন রক্ষী চলেচে।"

অমনি উঠলো হাসির হর্‌রা, শিষ, হিস্ হিস্ শব্দ।

ওদিক থেকে আর একজন বললে, "কি আর করবে! চোর-ডাকাত ধরে মজুরি পোষাচ্চে না এখন ভাল মানুষদের ধরচে।"

আবার কে যেন বললে, "লজ্জাও করে না হতচ্ছাড়াদের? দিনদুপুরে এমন কাণ্ড!" পুলিশেরা পা চালিয়ে চলছিল যেন মজুরদের বাক্যবাণ এড়াতে।

মা এ দৃশ্য দেখলেন। দেখলেন, শেমিওলোভ হাসিমুখে দুশমনগুলোর মাঝে চলেচে। কিন্তু তাঁর মন দুঃখে ভরে গেল। তবে এই ভেবে গর্ব বোধ হতে লাগলো এর মূলেও রয়েচে তাঁর ছেলে। তিনি খাদ্যগুলি বেচে বাড়ি ফিরে এলেন। তাঁর মনে নানা চিন্তা। ক্রমে সন্ধ্যা গাঢ় হয়ে এল। বসে বসে ভাবচেন, কখন আইভানোভিচ এসে ইস্তাহারগুলো দিয়ে যাবে। হঠাৎ দরজায় কে টোকা দিলে।

তিনি তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে দিয়েই দেখেন, আইভানোভিচ নয় শশেংকা! শশেংকা যেন আগের চেয়ে মোটা হয়েচে। তাকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, "তুমি? এতদিন কোথায় ছিলে?"

—"জেলে ছিলাম, মা।"

—"জেলে?"

—"হাঁ। আইভানোভিচ আসবার আগেই পোশাকটা বদলাতে হবে। এই নাও, ইস্তাহারগুলো।"

—"তুমি আনলে? আইভানোভিচ—"

—"ধর।" বলে সে গায়ের শালখানা খুলে নাড়া দিতেই তা থেকে ইস্তাহারগুলো পাতার মতো ঝরে পড়তে লাগলো। মা সেগুলো কুড়িয়ে নিতে নিতে বললেন, "তাই তোমাকে মনে হচ্ছিল মোটা। তুমি এলে কি করে?"

—"হেঁটে।"

—"এত রাস্তা এই বোঝা নিয়ে হেঁটে এলে? জেলে থেকে তোমার শরীর একেবারে আধখানা হয়ে গেচে। বস—বস—"

বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। শশেংকা উঠে দাঁড়ালো, মা অস্থির হলেন। শশেংকা বললে, "দরজা খুলো না। পুলিশ হলে বলো, আমাকে চেনো না। আমি অন্ধকারে ভুল করে তোমাদের বাড়িতে ঢুকে পড়েচি। হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েচি—তুমি পোশাক ছাড়াতে গিয়ে এই ইস্তাহার—"

মা বললেন, "আমাকে বাঁচাতে হবে না।"

শশেংকা কান পেতে ছিল; বললে, "না, পুলিশ নয়। মনে হচ্চে—"

তার কথা শেষ হতে হতেই ঘরে ঢুকলো আইভানোভিচ। সে শশেংকাকে দেখে বললে, "এই তো পৌঁছে গেচ দেখ্‌চি। এই মেয়েটি পুলিশকে কি রকম নাকাল করেছিল যদি শোন দিদিমা। জেলের ইনস্‌পেকটার ওকে কি একটা কথা বলে অপমান করে ছিল। আর যায় কোথা! বললে, ও যদি ক্ষমা না চায় আমি না খেয়ে থাকবো। আ—ট দিন কিছু খেলো না।

সে যে কি কাণ্ড! মর মর হলো। শেষে সে লোকটা ক্ষমা চাইতে পথ পায় না।"

মা বললেন, "তাই না কি?"

তিনি প্রশংসা ও স্নেহমাখা চোখে শশেংকার দিকে তাকালেন।

"কি করবো? তাকে দিয়ে ক্ষমা চাওয়ানোর ও ছাড়া আর কোন উপায়ও ছিল না।" বলে শশেংকা উঠে পড়লো। তাকে তখনই শহরে যেতেই হবে।

মা বললেন, "এই রাত্তিরে! এখানে থাকো না?"

—"উপায় নেই।"

আইভানোভিচও তার সঙ্গে যেতে পারলে না। তার তখনও সেখানে কাজ। মা চা তৈরি করে দিলেন। শশেংকা একাই বেরিয়ে পড়লো।

সে চলে গেলে আইভানোভিচ বললে, "জানো দিদিমা ও হলো জমিদারের মেয়ে। আদর-যত্নে মানুষ হয়েচে। জেলের জল-ভাত সইবে কেন? তাই গেচেন পট্‌কে। একটা মজার কথা জানো?

মা বললেন, "কি?"

—"পাভেল আর ও দুজনে দুজনকে বিয়ে করতে চায়।"

—"বটে! আমি তো জানি না। তা করচে না কেন?"

—"তার উপায় কি? দুজনে যেন পাল্লা দিয়ে জেলে ঢুকচেন। ইনি বাইরে থাকলে উনি জেলে, উনি বাইরে থাকলে ইনি জেলে। বিয়ে হবে কি করে?"

মায়ের বুক থেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এল।

আইভানোভিচ বললে, "কয়জনের জন্যে তুমি কাঁদবে দিদিমা! আমরা বিপ্লবীরা যে অনেক! সকলের জন্যে কাঁদলে শেষে চোখে আর জল থাকবেই না। আমাদের জীবনই এমন। বিয়ে আর বিপ্লব—দুটো এক সঙ্গে চলে না। আমাদের আর এক বন্ধুর কথা শোন। তিনি পাঁচ বছর পরে সেদিন ছাড়া পেয়ে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চললেন। যখন গিয়ে পৌঁছলেন তখন তাঁর স্ত্রীকে ধরে জেলে পুরেচে। আমারও স্ত্রী ছিল দিদিমা। কিন্তু তিনিও পাঁচ বছর জেল-ঘর করে দেহপাত করে এখন কবরে শুয়ে শান্তিতে আছেন।"

মায়ের দু'চোখে তবুও জল টল টল করতে লাগলো!

আইভানোভিচ কিন্তু পাথরের মূর্তির মতো শান্ত হয়ে নিঃশব্দে চায়ের পেয়ালাটায় চুমুক দিতে লাগলো। যে শীত!

নয়

পরদিন বেলা তখন দুপুর, মা গিয়ে দাঁড়ালেন কারখানার ফটকে, পিঠে খাবারের ভারী বোঝা। কিন্তু ফটকে বেজায় কড়া পাহারা। আজ কি কারণে যেন আরও বেশি। যে ঢুকচে তারই পোশাক তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখা হচ্চে।

মা বললেন, "বাবা, বোঝাটা আর বইতে পারচি না, ঢুকতে দাও। পিঠটা ফেটে গেল।"

দ্বারোয়ান বললে, "যা—যা—"

মা বোঝা নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। তারপর ফেরিওয়ালীর বসবার জায়গাটিতে খাবারের পাত্র দুটি নামিয়ে দম নিলেন। বুড়ো মানুষ! একেবারে হাঁপিয়ে পড়েচেন।

প্রথমে এল গুসেভরা দুই ভাই। তারা কারখানায় কামারের কাজ করে। বড় ভাই ভাসিলি ইসারা করে বললে, "চিজ্ পেলে?"

—"হাঁ, কাল।"

এটা তাদের গুপ্ত সঙ্কেত। দুভাই খুশী হয়ে মায়ের সামনে উবু হয়ে বসে খাবারের পাত্রটির দিকে ঝুঁকতেই এক বাণ্ডিল ইস্তাহার তার হাতে গিয়ে ভেতরের বুক পকেটে ঢুকে গেল। আবার কতকগুলো ঢুকলো জুতোয়।

দু ভাই বুড়ী-মায়ের সঙ্গে গল্প করচে, খাবারগুলো ঝুঁকে দেখচে, দর-দাম করচে।

আর সকলে দু-তিনজন করে এসে তাঁকে ঘিরে ধরচে। ফেরিওয়ালী মা হাঁকচেন, "চাই বাঁধাকপির টক সুপ, "চাই গরম ঝোল," "মাংস ভাজা," "চাই গরম রুটি।"

মজুরদের সবাইয়ের পেটভরা ক্ষুধা। তারা মায়ের কাছ থেকে খাবার কিনে খেয়ে গেল। কিন্তু গুসেভরা দু ভাই তেমনি বসে বসে একটু একটু করে খাচ্চে আর তাঁর সঙ্গে গল্প করচে। সকলে চলে গেলে মা বাকি ইস্তাহারগুলো তাদের হাতে চালান করে দিয়ে খালি পাত্র দুটি নিয়ে বাড়ি চললেন। তাঁর মনে আজ কি আনন্দ! কি গর্ব! মনে হলো, জীবনের একটি দিন সার্থক হয়েচে।

রাতে এল আনদ্রি। সে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছিল। মা কাঁদলেন তার বুকে মুখ রেখে ছোট মেয়ের মতো।

আনদ্রি বললে, "কেঁদো না মা। সে ভাল আছে। শিগগিরই আসবে। কোন ভাবনা নেই।"

তারপর তাঁর কাছে জেলের গল্প বলতে লাগলো।

তার গল্প শেষ হলে, মা বললেন, "আমি যে আজ তোমাদের একটা কাজ করে দিয়েচি।"

—"কি কাজ?"

মা বললেন, কেমন করে তিনি সেদিন কারখানায় ইস্তাহার বিলি করেচেন।

আনদ্রি বললে, "তুমি আমাদের কাজে আজ অনেক সাহায্য করেচো।"

মা বললেন, "একটা কথা শুনেচি তা কি সত্যি?"

—"কি কথা?"

—"পাভেল না কি শশেংকাকে বিয়ে করতে চায়?"

আনদ্রি বললে, "কথাটা সত্যি মা। ওরা দুজনেই দুজনকে ভালোবাসে সত্যি কিন্তু সে বিয়ে করতে পারে না। আমরা যে বিপ্লবী! আমাদের জীবনে তার সুযোগ কোথায়? ঘর-সংসার করবার ফুরসুৎ কৈ? পাভেল লোহার মতো শক্ত মানুষ! সে কখন টলবে না।"

মা বললেন, "জানি মানুষের মঙ্গলের জন্যেই তোমরা এত দুঃখ-কষ্ট যন্ত্রণা মাথায় নিয়েচো, জানি, তোমরা চাও সংসারে সত্যের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু বাবা ধনিকের দল যতদিন

দুনিয়ার বুকে, জনসাধারণের বুকে বসে থাকবে ততদিন সে সত্য প্রতিষ্ঠা হবে কি ? সকল মানুষের সুখের ব্যবস্থা কি করতে পারবে ? পারবে না, কিছুতেই না।"

—"কথাটা সত্যি বলেচো মা। কিন্তু সেটাই যখন আমাদের লক্ষ্য তখন অবস্থা যাই হোক এগোতেই হবে। তাতে প্রাণ যদি যায় যাক্।"

পরদিন দুপুরে মা খাবার নিয়ে আবার চললেন কারখানায়।

গিয়ে দেখেন দ্বারোয়ানেরা একেবারে আগুন হয়ে আছে। আজকের তল্লাশীটা ভারী জবরদস্ত্ রকমের।

তারা মাকে ধরলে ; বললে, "এই বুড়ী, দাঁড়া।"

মা ভয়ে ভয়ে বল্লেন, "দাঁড়াচ্চি বাবা। কিন্তু আমার খাবারগুলো জুড়িয়ে যাবে যে।"

—"যাক্।"

তারা মায়ের পোশাক হাঁতড়াতে লাগলো। কিছুই পেল না। তখন বললে, "যা।"

মা ভেতরে গেলেন।

বুড়ো মজুর শিজভ বললে, "বুঝলে, ইস্তাহারগুলো কালও ওরা ছড়িয়ে দিয়ে গেচে। তাহলেই দেখ, তোমার ছেলে, আমার ভাইপো এ সবের মধ্যে নেই। তবুও তাদের ধরে নিয়ে গেল। কি অত্যাচার বল দেখি!"

মা ঘাড় নাড়লেন। তিনি হাঁকতে লাগলেন, "তাজা খাবার," "গরম ঝোল", "টক সুপ।"

মজুরেরা ছুটে এল। সকলেই উত্তেজিত। সকলের মুখেই আলোচনা। ম্যানেজার, তাঁর সহকারী, কেরানি—কর্তাদের সকলেই—ক্ষেপে উঠেচে। বলচে, "এই দুশমনের দোসর মজুরগুলোকে দিতে হবে ঝাড়ে-বংশে সাবড়ে। যত সব পচা জিনিষ!"

গুসেভরা আজও এল! বড় ভাই বললে, "মা, তোমার খাবারগুলো খাশা! যে খায় সেই তারিফ করে। কিন্তু সকলে পড়তে জানে না বলে দুঃখ করে।"

মা শুনে খুশি হলেন ; দুঃখও হলো যে, অনেকে লেখা-পড়া শেখেনি বলে পড়তে পারে নি। খাবার বেচে তিনি বাড়ি এলেন। আনদ্রি বই পড়ছিল। মা তাকে কারখানার খবর দিয়ে বললেন, "যারা পড়তে জানে না, তারা দুঃখ করছিল। আমিও তো তাদেরই মতো। ছেলেবেলায় যা একটু-আধটু শিখেছিলাম তাও একেবারে ভুলেই গেচি।"

—"আমি তোমায় পড়তে শেখাবো, মা।"

—"এই বুড়ো বয়সে?"

—"শেখবার আবার বয়স কি?"

এবং সেদিন থেকেই বর্ণের সঙ্গে মায়ের পরিচয় শুরু হলো।

পড়তে পড়তে মায়ের চোখে জল এল। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "আজ বাদে কাল মরবো, এখন শুরু করলাম লেখাপড়া!"

আনদ্রি বললে, "এতে তোমার দোষ কি? এমন অবস্থায়

কি ইচ্ছে করে পড়েচো মা? তুমি তো তবু নিজের দুঃখের অবস্থাটা বুঝতে পারচো। অনেকে তো তা পারেই না। তারা বেঁচে আছে গরু-ছাগলের মতো। তবুও মনে করে, খাশা আছি। তারা বোঝে কেবল কাজ আর খাওয়া। জীবনটা যেন কেবল ওর জন্যেই। আর এই ভারবাহিদলকে কর্তারা পায়ের তলায় রেখে, তাদের পিঠে চড়ে, তাদের দিয়ে কাজের মোট বইয়ে নিজেদের জন্যে দৌলৎখানা গড়ে তোলে। এরা আপত্তি করলে, নিজেদের অবস্থায় সচেতন হয়ে উঠতে চাইলে, মানুষের মতো বাঁচবার অধিকার চাইলে, আইন করে জেলে দেয়, হত্যা করে, সর্বনাশের আরও কত চেষ্টা করে। তাদের এই আইনকে কাজে খাটায় ঐ সব লোকেরা। ধনিকেরা তাদের করে রাখে দাসের মতো। এই দাসত্ব থেকে যারা মুক্ত হ'তে চায় তারাই তো মানুষ। অবশ্য সে জন্যে চাই শিক্ষা। শিক্ষা না হলে কিছুই হবে না মা। আমাদের এই সংগ্রাম হবে মিথ্যা।"

মা আনদ্রির কথাগুলো বুঝলেন। তাঁর মনে আরও উৎসাহ দেখা দিল। তিনি বেশ মন দিয়ে শিখতে লাগলেন।

আনদ্রি বললে, "মা, পাভেল ফিরে এসে যখন দেখবে তুমি লিখতে-পড়তে শিখেচ তখন ভারী সুখী হবে। তোমাকে দিয়ে কত কাজ হবে আমাদের।"

—"আমাকে দিয়ে?"

—"হাঁ।"

সেদিন থেকে মায়ের মনে জাগলো আত্মশক্তিতে বিশ্বাস।

* * *

মায়ের দিন কেটে যাচ্ছে, লেখা-পড়ায়, সংসারের কাজে ও সমাজতন্ত্রীদের অর্থাৎ তাঁর ছেলের দলকে সাহায্য করে।

একদিন এলেন বৃদ্ধ রিবিন। এসে মায়ের সঙ্গে আলোচনা জুড়ে দিলেন। বললেন, "আমার সন্দেহ হচ্চে, এই সব ইস্তাহারের খরচ যোগায় কর্তারা। আর এই সব ইস্তাহার লেখেও তারা। এর পেছনে তাদের উদ্দেশ্য আছে।"

শুনে মা শিউরে উঠলেন ; বললেন, "তবে কি বল্‌তে চাও আমার পাভেলও তাদের সঙ্গে আছে? তারা কখন কোন নোংরা কাজ করতে পারে না।"

—"তা জানি। তবু বলচি, সেই শয়তানদের কাছ থেকে তফাতে থাকাই ভাল।"

—"তুমি কি করতে চাও?"

—"আমি এখান থেকে চলে যাচ্চি গ্রামে। সেখানে কাজ করবো। গ্রামের লোকদের বোঝাবো। আমার কাজ এখানে নয়। যা সত্য তাই তাদের চোখের সামনে ধরবো। তারা সত্যকে বুঝে নিক, নিজেদের অবস্থা বুঝে নিজেরাই পথ করে চলুক। আমি তাই যাচ্চি মজুরদের ছেড়ে চাষীদের কাছে।"

—"তারা তোমার কথা শুনবে?"

—"কেন শুনবে না? যে ভাবে বললে শুনবে সেই ভাবে বল্‌বো।"

—"এ কাজে তোমার বিপদ আছে, রিবিন। তুমি জেলে যাবে। চাষীরাও তোমার ওপর অত্যাচার করবে।"

—"তা হোক। তাতে ক্ষতি নেই। যে বীজ ছড়িয়ে

যাবো তা অঙ্কুরিত হবেই। আমি যাবো সকলের কাছে। আনদ্রিকে বলো আমার কথা।”

—“বলবো। তুমি এখনও কারখানায় কাজ করচো ?”

—“না, ছেড়ে দিয়েচি।”

—“কবে যাবে ?”

—“কাল সকালে।” রিবিন চলে গেলেন।

মা একা বসে রইলেন। অন্ধকার রাত। তাঁর মনে হতে লাগলো, তাঁর সারাজীবনই এম্নি ঘন অন্ধকারে কেটে গেল।

খানিক পরে এল আনদ্রি। মা তাকে রিবিনের কথা বললেন।

আনদ্রি খুব খুশি হলো; বললে, “তিনি ঠিক কাজ করেচেন। গ্রামে যাওয়া দরকার। চাষীদের মধ্যে গিয়ে কাজ না করলে হবে কি করে ?”

মা বললেন, “রিবিন বলছিল, তোমাদের টাকা আসে কোথা থেকে ? কে টাকা দেয় ? যাদের বিরুদ্ধে মজুরেরা লেগেচে এ টাকা কি আসে তাদের কাছ থেকে ?”

আনদ্রি হেসে উঠলো ; বললে, “মা, এ কি হয় ? টাকারই তো আমাদের অভাব। কত কষ্টে যে আমাদের টাকার জোগাড় হয়! টাকা থাকলে ভাবনা কি ছিল ? আমাদের টাকা দেয় মজুরেরা। ওই তো সামান্য মজুরি, তা থেকে দান করে। ছাত্রেরাও দিয়ে থাকে। তারাও কত কষ্ট করে দেয়। তবে কর্তাদের কথা যা বলেচো তার মধ্যে একটু সত্যি আছে বৈকি। ভাল-মন্দ মানুষ দুই-ই আছে। তারাও দেয় কিছু।

যেদিন আমাদের জয় হবে, সেদিনও যদি তারা আমাদের সঙ্গে থাকে বুঝবো তারা খাঁটি, আমাদের ফাঁকি দিচ্চে না।"

মা তার কথা শুনে খুশি হলেন ; বললেন, "তাই বলো !"

আনদ্রি বললে, "মা, সেদিন আর বেশি দূরে নেই যেদিন পৃথিবী থেকে মানুষের অত্যাচার উঠে যাবে। মানুষ আর মানুষকে দাস করে রাখবার সুযোগ পাবে না। এক নূতন পৃথিবী গড়ে উঠচে। আমারই গড়ে তুলচি। অত্যাচারীকে, নিষ্ঠুর, স্বার্থপর, লোভীকে নির্মূল আমরা করবোই। সেদিন আসচে যেদিন সব মানুষই দাঁড়াবে এক সারিতে, মানুষ যা-কিছু গড়ে, উৎপন্ন করে, সবই নেবে সমান ভাগ করে। কাউকে অভাবের তাড়নায় আর কষ্ট পেতে হবে না। কেউ কাউকে শোষণ করতে পারবে না।"

মা আনদ্রির কথাগুলো গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনে গেলেন। আর, আনন্দে তাঁর বুক ভরে উঠলো। বললেন, "সেদিন কি দেখে যেতে পারবো ?"

—"হয়তো মা সেদিন আমিও দেখে যেতে পারবো না, তাকে আনবার পথেই আমায় জীবন হারাতে হবে। তবুও দুঃখ নেই। জীবন দান না করলে তা আসবে না এবং তা আসবেই। যারা তখন থাকবে তারা সুখী হবে। আমরা কেবল বর্তমানের সুখের কথাই ভাবচি না, ভবিষ্যতের মানব-সমাজের কথাও ভাবচি।"

* * *

মায়ের পড়া এগিয়ে চললো। কিন্তু বুড়ো মানুষ। চোখের

সে দৃষ্টি আর নেই। পড়তে কষ্ট হয়। আনদ্রি তাঁকে শহরে নিয়ে গিয়ে চশমার ব্যবস্থা করে দিল।

মা পাভেলের সঙ্গে দেখা করতে তিনবার জেলে গিয়েছিলেন। কিন্তু জেলের কর্তা তিনবারই ফিরিয়ে দিয়েচে; ছেলের সঙ্গে দেখা করতেই দেয়নি। বলেচে, "এখন হবে না, আসচে সপ্তাহে।" ফিরিয়ে দিলেও কর্তা মায়ের সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহারই করেছিল।

মা তাই আনদ্রিকে বল্‌লেন, "লোকটি বড় বিনয়ী।"

উত্তরে আনদ্রি বল্‌লে, "বিনয়ী বটে কিন্তু অম্নি বিনয় নিয়ে ওরা সাধুকেও ফাঁসিতে লটকাতে পারে। ওরা কেউই মানুষ নয়। বোধশক্তি ওদের কারোরই নেই; হৃদয়ও নেই। ওরা যন্ত্রের মতো। জীবনে শিখেচে কেবল হুকুম তামিল করতে; প্রাণহীন কলের মতো হুকুম তামিল করে যায়। ওদের মনিবেরা ওদের শেখায়ও তাই।"

মা তার কথা বিশ্বাস করলেন।

তিনি আর একদিন গেলেন ছেলের সঙ্গে দেখা করতে জেলে। এবার মায়ে-ছেলেয় দেখা হলো বটে কিন্তু সেখানে দুশমনের মতো এক রক্ষী দাঁড়িয়ে রইলো। সে বললে, "ঘর-সংসারের কথা ছাড়া আর কোন কথা তোমরা বলতে পারবে না।"

মায়ে-ছেলেয় আলাপ শুরু হলো। মা ছেলের কুশল-বার্তা জিগ্যেস করলেন; ঘর-সংসারের কথা বললেন। জিগ্যেস করলেন, কবে তাকে ছেড়ে দেবে? তারপর বললেন,

"ইস্তাহারের জন্যে তোকে ধরেচে। কিন্তু কারখানায় আবার তো ইস্তাহার করা ছড়িয়ে গেচে।"

—"ছড়িয়ে গেচে? কত ছড়িয়েচে?" পাভেলের চোখ-মুখ আনন্দে জ্বলতে লাগলো।

রক্ষী বললে, "এই খবরদার! ও সব কথা বলবে না।"

পাভেল জিগ্যেস করলে, "তুমি কিছু কাজ-কর্ম করচো?"

—"হাঁ। ফেরি করি। কারখানায় সে সব আমিই দিয়ে এসেছিলাম। ক'দিন পারি নি।" বলে তিনি পাভেলের দিকে এমন ভাবে তাকালেন যে, সে তাঁর মনের কথা বুঝতে পারলে। আনন্দে সে ফেটে পড়বার মতো হলো। বল্‌লে, "যাক, আমার বড় আনন্দ হচ্চে যে, তুমি একটা কাজ পেয়েচো মা। কারখানায় তোমায় যেতে দিলে?"

—"ইস্তাহার ছড়াবার পর ফটকে আমাকেও—"

রক্ষী বললে, "আবার! চট্‌পট্ কথা শেষ করো। সময় হয়ে গেচে।"

মা ছেলের কাছ থেকে চোখের জলে বিদায় নিলেন। ছেলের জন্যে দুঃখে তাঁর বুক ভেঙে যেতে লাগলো।

দশ

তার দিন তিন পরে। তখন রাত হয়েচে। ঘরে আলো জ্বল্‌চে, মা একা বসে পড়চেন। ঘরে একটি লোক ঢুকলো। মা তাকে প্রথমটা দেখে অবাক, তারপর খুশি হলেন। বললেন "তুমি? তুমি কোথা থেকে?"

পৃষ্ঠা: ৫৬

—"আমি জেল থেকে আসচি। তোমার ঘরে আলো দেখে ঢুকেচি।" বলে নিকোলাই এগিয়ে এল।

—"বস, বস। একেবারে শুকিয়ে গেচো।" চোরের ছেলে বলে মা তাকে কোন দিনই পছন্দ করতেন না। কিন্তু আজ তাকে লাগ্‌লো ভাল। আবার বললেন, "দাঁড়াও, একটু চা তৈরী করি।"

আনদ্রি রান্নাঘরে কি করছিল; বললে, "মা, আমিই তৈরি করচি।"

নিকোলাই বসে মায়ের সঙ্গে আলাপ করতে লাগলো। কিন্তু মা দেখলেন, তার গলার স্বর কেমন অদ্ভূত, চোখের দৃষ্টিতে সন্দেহ ও ম্লানতা।

আনদ্রি চা নিয়ে ঘরে ঢুকলো।

নিকোলাই বললে, "দেখ, কতকগুলো লোককে মেরে ফেলা দরকার।"

আনদ্রি গম্ভীর ভাবে বললে, "কেন বল তো?"

—"তাদের একেবারে শেষ করে ফেলতে হবে।"

—"কেন বল তো? মানুষকে মারবার অধিকারটা তোমাকে দিচ্চেই বা কে?"

—"যাদের মেরে ফেলা হবে অধিকার দিচ্চে তারাই। এই সব লোকগুলোকে আমি ঘৃণা করি। তারা আমার শত্রুতা করেচে। আমিও তাদের শত্রুতা করবো। আমার বাবা চোর কিন্তু—" বলেই থেমে গেল। তারপর হঠাৎ রাগে বলে উঠলো "আইসে দুশমনটার মাথা ভাঙবো—নিশ্চয়ই ভাঙবো।"

আনদ্রি তার মুখের দিকে তাকিয়ে তার মনের কথাটি কতকটা আন্দাজ করলেও জিগ্যেস করলে, "কেন ? সে কি করেচে ?"

—"সে ? সে হলো গোয়েন্দা ! নোংরা, পচা, দুর্গন্ধময় একটা জীব। সে মানুষের সর্বনাশ করচে। তার জন্যে আমার বাবাও চরগিরির মতলব আঁটচে—"

আনদ্রি এতখানি আন্দাজ করতে পারে নি। এবার বুঝলে, নিকোলাই কেন এমন মরীয়া হয়ে উঠেচে। চরকে সে চোরের চেয়েও নিকৃষ্ট মনে করচে। নিজের পিতার অধঃপতন কোন ছেলে সুস্থ মনে দেখতে পারে ? এম্নিতেই পিতার জন্যে তার জীবনটা জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছিল, এখন তার জ্বালা হলো অসহ্য।

নিকোলাই আবার বললে, "আমার বুকে হাত রেখে দেখো, কী আগুন ! কি ভীষণ কোলাহল উঠ্চে। যেন একদল ক্ষুধার্ত নেকড়ে চীৎকার করচে।"

আনদ্রি তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলে ; তাকে বোঝালে।

কিন্তু নিকোলাইর মন সান্ত্বনা মানলো না। বললে, "আমার আর বাড়ি যেতে ইচ্ছা হচ্চে না।"

মা বললেন, "বেশ তো, তুমি এখানেই থাক। ঠিকই তো। বাড়িতে কেই বা আছে ? কার কাছেই বা যাবে ?"

খেতে খেতে আনদ্রি নিকোলাইকে বোঝাতে লাগলো ; বললে "লোকে যখন তাদের কথা বুঝ্তে পারবে, তখন আর

এ ভাব থাকবে না। কারখানায় সমাজতন্ত্রবাদের প্রচার বেশ ভাল ভাবেই চল্‌চে। মজুরদের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়েচে।”

নিকোলাই বললে, “কিন্তু খুব আস্তে হচ্চে! আরও তাড়াতাড়ি হওয়া দরকার।”

আনদ্রি বললে, “মানুষের জীবন ঘোড়া নয়। তাকে চাবুক মেরে জোরে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না। সে চলে তার স্বাভাবিক চালে।”

—“আমার তাতে ধৈর্য থাকে না আমি চাই—”

—“কিন্তু প্রথমে শিখতে হবে, জানতে হবে, লোকের মধ্যে জ্ঞান-বিস্তার করতে হবে।”

—“জানি তা। কিন্তু তার আগে আমাদের বহু জীবন দান করতে হবে।”

—“জানো নিকোলাই, ধারালো অস্ত্রের চেয়ে আগে দরকার ধারালো, বুদ্ধির।”

রাত গভীর হলে তারা শুতে গেল।

দিন যায়। সমাজ-তন্ত্রীদের প্রত্যহ মায়ের বাড়িতে মজলিশ বসে। কর্মীরা নানা জায়গা থেকে আসে; পরামর্শ করে, কাজ করে। মায়ের ওপর ইস্তাহার ছড়াবার ভার। তিনি কারখানায় ইস্তাহার ছড়ান। রক্ষীরা তাঁকে তল্লাস করে কিন্তু কিছুই পায় না। তাতে তাদের রাগ ও জেদ বেড়ে ওঠে। মাও সাফল্যে কর্তব্যটির ওপর আরও অনুরক্ত হন।

নিকোলাইকে কারখানার কর্তারা ছাড়িয়ে দিয়েচে। সে

এখন কাজ করে এক কাঠগোলায়। মজলিশে সেও আসে। সবাই চলে গেলেও সে বসে থাকে, আনদ্রির সঙ্গে সমানে তর্ক-আলোচনা করে।

একদিন নিকোলাই বললে, "মানুষ যে আজ নিঃস্ব, দীন, এই অবস্থার জন্য দায়ী কে? রুশ-সম্রাট্?"

আনদ্রি বললে, "না। যে মানুষটি প্রথমে বলে ছিল, এই আমার সম্পত্তি সে। তবে সে লোকটি ছিল হাজার হাজার বছর আগে। তার কাছ থেকে কথাটি ছড়িয়ে গেছে যুগযুগান্তরে।"

—"ধনিক, মহাজন আর তাদের দালালেরা তা হলে নির্দোষ?"

আনদ্রি তাকে বোঝাতে চেষ্টা করে। এই আর্থিক ও সামাজিক ব্যবস্থার জন্যে দায়ী কেবল ওদের করলেই চল্‌বে না। সাধারণ মানুষেরও এতে কিছুটা হাত আছে। তারা অজ্ঞ। তারাও এটা মেনে নিয়ে মার খাচ্চে। তবুও মনে করচে, বেশ আছি।

নিকোলাই বললে, "আমি তা মানি না। মানি না যে জনসাধারণও এর সঙ্গে কিছুটা জড়িত। আমি জানি, ওই সব পরগাছাই জনসাধারণের জীবনরস শুষে খেয়ে দিব্যি আছে। চারধারে নানা আগাছা। সবগুলোকে নির্মূল করতে হবে।"

আর একদিন কথায় কথায় বললে, "আর, এদের দালাল হচ্চে আইসের মত লোকেরা।" বল্‌তে বল্‌তে তার চোখ দুটো জ্বলে উঠলো। "ওদের মতো শয়তানকে দূর করতেই হবে।" বলে সে চলে গেল।

আনদ্রি বললে, "মা, আইসে সত্যিই শয়তান। ও বেজায় বেড়ে উঠেচে। লোকের পিছনে লেগেই আছে; ঘরের আনাচে-কানাচে ঘুর্ ঘুর্ করচে। নিকোলাই যে রকম ক্ষেপে উঠেচে তাতে ও তাকে একদিন খুব শিক্ষা দেবে। নিকোলাইর মতো লোক ক্ষেপলে রক্ত পাত না করে ছাড়ে না"

মা তার কথা বুঝলেন। বুঝলেন, নিকোলাই একদিন সাংঘাতিক একটা কিছু করে বসবে।

একদিন জেল থেকে ছাড়া পেয়ে হঠাৎ পাভেল এল। মায়ের আনন্দ ধরে না। আনদ্রি এল। তিনজনে কত কথা! মা চা আনলেন, খাবার আনলেন। আনদ্রি স্থানীয় সব খবর দিয়ে বললে, "রিবিন গ্রামে গেচেন চাষীদের মধ্যে কাজ করতে।"

পাভেল বললে, "তাতে আমাদের কতটা লাভ হবে? রিবিনের বয়স হলেও তাঁর এখন অনেক শিক্ষা দরকার। তাঁর সম্বল কি? তাঁর পূর্ণজ্ঞানের অভাব। আমি থাকলে যেতে দিতাম না।"

আনদ্রি বললে, "আঘাতে আঘাতে যার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেচে, যে ক্ষিপ্ত সে কার কথা শুনবে? কে তাকে ধরে রাখবে? এটাও সত্যি।"

—"কিন্তু এটাও কি সত্যি নয় যে, জ্ঞান মনের অন্ধকার দূর করতে পারে?"

দুজনে এম্নি করে শুরু হলো তর্ক। মা বসে বসে শুনতে লাগলেন; তাদের সব কথা বুঝতে না পারলেও এটা বুঝলেন

যে, পাভেল চাষীদের জন্য যে পথ স্থির করে রেখেচে তার থেকে একটুও নড়তে চায় না। আনদ্রির মত, চাষীদের শিক্ষা দিয়ে নিতে হবে। তাহলেই তাদের দিয়ে কাজ পাওয়া যাবে। মায়ের মনে হয়, আনদ্রিই ঠিক কথা বলচে।

সামনে মে মাস। বসন্ত কাল। শীত চলে গেল। মজুরেরা, যারা জেলে ছিল, তারা মুক্তি পেয়ে ফিরে এল। মে মাসে মজুরদের উৎসব হবে। তারই আয়োজন হতে লাগলো। কিন্তু কি ভাবে উৎসব হবে তাই নিয়ে হলো মতভেদ। তার ফলে হলো দুটি দল।

একদল বললে, "মজুরেরা অস্ত্র হাতে সারি বেঁধে পথে বার হয়ে জয়ধ্বনি করবে।"

অপর দল বললে, "না, মজুরেরা নিশান হাতে সারি বেঁধে পথে পথে ঘুরবে, সাম্যবাদের জয়ধ্বনি করবে।"

মিছিল নিয়ে এই মতভেদে শেষের দলেরই হলো জয়। কারণ তাদের দলটি বেশি ভারী ; তার ওপর তাদের কথার মধ্যে ছিল যুক্তি। তারা বললে, "আগে অস্ত্র চাই না, চাই শিক্ষা, লোকের মনের পরিবর্তন।"

এ কথা শুনে মায়ের মনে হলো, ওরাই ঠিক বলচে। তাদের কাছেই শুনলেন, সমাজের একটি শ্রেণী হলো সমগ্র মানব সমাজের শত্রু। তাদের বলে, বুর্জোয়া। শব্দটি ফরাসী। এরা সমাজে একটি বিশেষ স্থান দখল করে সকলের কাছ থেকে সম্মান আদায় করে। এদের হাতেই ধনদৌলত। সমাজও চলে এদেরই কথায়, ইচ্ছায় ও সুবিধামতো। ধনিক,

মহাজন, জমিদার, ব্যবসায়ী, কারখানার মালিক, দালাল প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। যাদের বলা হয় মধ্যবিত্ত তারাও বুর্জোয়া। মধ্যবিত্তদের মধ্যে আছে তিনটি স্তর—উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন। এই বুর্জোয়া শ্রেণীর সংখ্যা বেশি নয়। এরাই মানুষের নিষ্ঠুরতম শত্রু, মানুষকে ঠকায়, সমাজ-দেহে আছে বিষের মতো। পরের রক্ত খেয়ে ফুলে উঠ্‌চে।

মায়ের বাড়িখানা এখন সারা দিনরাত গম্ গম্ করে। কত লোক যে আসে, আলোচনা করে, মজলিশ বসায়। মা দেখেন, তাঁর ছেলেই তাদের কেন্দ্র। আনদ্রিকেও তারা তাঁর ছেলের মতো শ্রদ্ধা করে।

শশেংকাও মাঝে মাঝে আসতে লাগলো। একদিন আড়াল থেকে শুনতে পেলেন, শশেংকা পাভেলকে বলচে, "তুমিই মিছিলে নিশান বয়ে নিয়ে যাবে ?"

পাভেল বললে, "হাঁ। আমি ছাড়া আর কেউ নিশান বইতে পারে না।"

—"তুমি আবার জেলে যাবে ? আর কেউ নিয়ে গেলে হতো না ?"

—"না।"

—"তুমি জেলে গেলে আমাদের কত ক্ষতি হবে একবার ভেবে দেখচো কি ? তোমার আর আনদ্রির মতো বিপ্লবী আমাদের মধ্যে আর নেই। আবার যদি তারা তোমায় ধরতে পারে তাহলে আর সহজে ছাড়বে না, এখান থেকে বহু দূরে সরিয়ে ফেলবে।"

—"তবুও যা সংকল্প করেচি তা থেকে একচুলও নড়বো না। কেউ আমাকে টলাতে পারবে না।"

—"আমার অনুরোধেও না?"

—"তোমার এমন অনুরোধ করা উচিত নয়।"

—"কিন্তু পাভেল, আমি তো মানুষ!"

—"তুমি তারও বেশি। সেইজন্যেই তোমাকে—তুমি এমন অনুরোধ করতে পারো না।"

—"তাই হোক!"

মা এবার দুজনকে পরিষ্কার বুঝতে পারলেন। ওরা দুজনে পরস্পরকে ভালোবাসলেও যে কর্তব্যের ভার নিয়েচে তাতে কেউ কাউকে বিয়ে করতে পারে না। ওরা বিপ্লবী। সংসার-ধর্ম ওদের জীবনের সঙ্গে খাপ খায় না। মায়ের মন দুঃখে ভরে উঠলো। চিরজীবনই কি ওরা কষ্টভোগ করবে? যখন শুনলেন, পাভেল নিশান হাতে মিছিলে সকলের আগে আগে যাবে তখন আবার তাঁর মন দুশ্চিন্তায় ভরে গেল।

জিগ্যেস করলেন, "পয়লা মে কি হবে?"

পাভেল বললে, "মিছিল বার হবে—মজুরদের মিছিল। আমি যাবো সকলের আগে আগে নিশান হাতে। মিছিলকে চালিয়ে নিয়ে যাবো আমিই।"

—"এতে বিপদ নেই?"

—"বিপদ? এর জন্যে আমাকে পুলিশ গ্রেফতার করতে পারে। জেলও হবার সম্ভাবনা।"

মায়ের চোখ দুটি সজল হয়ে উঠলো।

পাভেল বললে, "এ কাজ যে আমায় করতেই হবে। এ আমার কর্তব্য। কর্তব্যে তুমি বাধা দেবে?"

মা আস্তে আস্তে বললেন, "না, বাধা দেবো না।"

তবুও তাঁর চোখের জল শুকোলো না।

পাভেল তা লক্ষ্য করে বললে, "দুঃখ করো না। সব মায়েরই আজ কর্তব্য তাঁদের ছেলেদের হাসিমুখে এম্নি কর্তব্যে এগিয়ে দেওয়া।"

আনদ্রি তাকে একটু খোঁচা দিলে, বললে, "একটু আস্তে।"

মা বললেন, "আমি মা। ছেলের বিপদে চোখের জল না ফেলে কি থাকতে পারি? তোমায় আমি বাধা দিচ্ছি না।"

পাভেল বলে উঠলো, "এক রকমের ভালোবাসা আছে যা সারা জীবনকে নষ্ট করে।"

মায়ের বুক কেঁপে উঠলো; বললেন, "আমি তোমায় বাধা দেবো না। বুঝচি, তোমার বন্ধুদের জন্যে তোমায় এই কাজ করতে হচ্চে।"

পাভেল বললে, "বন্ধুদের জন্যে হলে নাও করতে পারতাম। আমার নিজের জন্যেই করা দরকার।"

মা আর কিছু বললেন না, নীরবে চলে গেলেন।

আনদ্রি ছিল দরজায় দাঁড়িয়ে। সে সব শুনে ছিল। রুখে উঠে বললে, "মায়ের ওপর ওর এমন আস্ফালনের দরকার কি ছিল? এমন মা কজনে পায়? কেন এমন রূঢ় আচরণ করবে ও?"

তার কথায় পাভেলের হুঁশ হলো ; বুঝতে পারলে অন্যায় করেচে। সে মায়ের কাছে ক্ষমা চাইলে। মা জল হয়ে গেলেন। বললেন, "আচ্ছা তোমার যা ইচ্ছা হয় কর।" আনদ্রিকে বললেন, "ওর ওপর আর রাগ করে থেকো না।"

আনদ্রি বললে, "ওর ওপর কি আমি রাগ করে থাকতে পারি ? ওকে আমি ভালোবাসি। কিন্তু ওর বড় দেমাক হয়েচে। সেই দেমাকেই যাকে-তাকে ধাক্কা দেয়। এম্নিতেই মানুষের দুঃখের অন্ত নেই। তার ওপর ধাক্কা দিয়ে জ্বালা বাড়ানো কেন ?"

পাভেল হেসে বললে, "এইবার থামো। অনেক ব্যাকবাণ ছাড়লে তো!"

দুই বন্ধু আলিঙ্গনে আবদ্ধ হলো। মা দেখলেন, যেন তাঁর দুই ছেলে। তাঁর চোখে এল আনন্দের ধারা।

মা বললেন, "দেখ, এ দুঃখের মাঝেও আজকাল আমার মনে দেখা দেয় এক নতুন আনন্দ যা আগে কখন বুঝতে পারিনি। সব যেন বদলে যাচ্চে।"

আনদ্রি বললে, "ঠিক বলেচো মা। দুনিয়াতে এক নতুন জীবনের জন্ম হচ্চে। নতুন মানুষ দেখা দিচ্চে। আসচে নতুন আনন্দ। স্বার্থপরতা, লোভ, শোষণ এ সব দূর হয়ে যাবে দুনিয়া থেকে। কিন্তু তার আয়োজন করতে হবে, তাকে আনতে হবে ; না হলে সে আসবে কেন ?"

মা তাদের সঙ্গে আনন্দে কাজ করতে লাগলেন। পড়ায় তিনি হলেন অনেক অগ্রসর।